পার্বত্য তথ্য কোষ

১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম আতিকুর রহমান লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ' ০১ সেট বই তাঁর ছেলে ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ -৮

নির্বাচিত রচনা বলী

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই : পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০
লেখক : আতিকুর রহমান
প্রকাশক : পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট
প্রকাশ কাল : নভেম্বর ২০০৭ ইং
কম্পোজ : বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।
পেষ্টিং : আবু তাহের ঐ
মুদ্রাকর : বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
: মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।
প্রচ্ছদ : শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখকের নিজের
অনুবাদ : লেখকের অনুমতি সাপেক্ষ
পরিবেশক : ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য : খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-
যোগাযোগে : আতিকুর রহমান মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮

পার্বত্য তথ্য কোষ

খণ্ড-৮ ঃ নির্বাচিত রচনাবলী

সূচীপত্র ঃ

ঝুলন্ত সেতু রাঙ্গামাটি

ভূমিকা ঃ

পার্বত্য সংকটের মূল্যায়ন ও সমাধান সুপারিশ

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় অধিবাসীদের ব্যাপারাদি সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে না। এ সংক্রান্ত প্রথম ভুল হলো ঃ এই অবাঙ্গালী লোকজনকে স্থানীয় আদি স্থায়ী অধিবাসী রূপে জ্ঞান করা হয়, এবং এতদাঞ্চলকেও মনে করা হয় অবাঙ্গালী অঞ্চল। এটাই স্থানীয় তথ্য রূপে রাজনীতি বিজ্ঞানের শক্ত ভিত্তি হয়ে এতাদাঞ্চলীয় সমস্যা সংকটের পরিপোষন করছে। নৃবিজ্ঞান মতে ও স্থানীয় উপজাতীয়রা বাঙ্গালী নয়, পৃথক এক জাতিসত্তা, যারা নিজেদের এই আবাসস্থলে বহিরাগত সংখ্যাগুরু এবং এখানে তারা স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। নিজেদের আধিপত্য ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ বিরোধী।

কোন জাতির অধিকারগত মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে তাকে কখনো কোথাও দমান যায়নি। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক আমলের পরে আজকাল এমনটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানবধিকার মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের নামে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সর্বত্র সবার কাছে সমর্থিত। তবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য এবং উচ্চাভিলাষের দ্বারা কোন অঞ্চল গ্রাস ও কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দ্বারা মানবিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তিকে বিঘ্নিত করা আকাঙ্খিত নয়। আত্মরক্ষার এ পথটি এখনো অবারিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিপক্ষে বাংলাদেশ এখন অবরুদ্ধ। এ ব্যাপারে চুক্তি ও বিধিবিধান হয়েছে ঃ এতদাঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এখানে তাদের কিছু অগ্রাধিকার প্রাপ্য, কিছু উচ্চপদ তাদের জন্য সংরক্ষিত। বাঙ্গালীদের অবাধ ভূম্যাধিকার, ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধিত্ব এখানে নিয়ন্ত্রিত।

এই স্বীকৃতি ও চুক্তি হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পথে মূল্যবান অগ্রগতি, যা বিশ্ব সমাজের কাছে অঙ্গিকার বিশেষ। সোজাসুজি এর ভিন্নতা করার উপায় নেই। বিশ্ব সমাজ কর্তৃক বাংলাদেশকে উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দানে বাধ্য করার পক্ষে এটি এক মাইলফলক। পার্বত্য চুক্তি ভঙ্গ করা হলে, বাংলাদেশকে শান্তি ভঙ্গ, অধিকার হরণ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে।

উপজাতিদের নিত্যদিনের রাজনৈতিক কৌশল অভিনব। চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত মন্ত্রী, এমপি, রাজা, চেয়ারম্যান পদ উচ্চ বেতন ভাতা, গাড়ীবাড়ি বিলাসী সুবিধার কিছুই যথেষ্ট নয়। এগুলো এ পর্যন্ত তাদের সন্তুষ্ট করেনি। এ পথে উপজাতীয় পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা কামনা বাস্তব নয়। আসলে তারা উচ্চাভিলাষী বহিরাগত বংশোদ্ভূত লোক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তারা আগ্রহী নয়। এদের পালন পোষন ও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দান বিড়ম্বনাকর। সর্বোপরি

এরা বাংলাদেশের মূল নাগরিক বাঙ্গালীদের ও দেশের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে এতদাঞ্চলে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়।

স্থানীয় সরকারি প্রশাসন আর প্রতিরক্ষাকেও উপজাতীয় করণে তারা উদ্বুদ্ধ। এসবই ধৃষ্টতাপূর্ণ রাজনৈতিক উচ্ছাকাঙ্খা। এই বাড়াবাড়ি অসহনীয়। এতে তাদের সহ দেশ ও জাতির এক হয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই। বৃটিশ আমলে এদের পূর্বপুরুষেরা এতদাঞ্চলে উদ্বাস্তু রূপে এসেছিলো। ঐ বৃটিশরাই তাদের হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলভূক্ত অভিবাসন আইন ৫২ বলে বাংলাদেশবাসীর অনুমোদন ছাড়াই এতদাঞ্চলে স্থান দিয়েছে। এখনো তারা চরিত্রে মননে বিদেশী ও বিজাতীয় থেকে গেছে। তারা বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী স্বজন হতে পারেনি। এদের মাঝে সর্বাধিক উগ্র অবাধ্য আর বৈরী সম্প্রদায় হলো চাকমারা। এরা দেশ দ্রোহে অন্যান্য সহযোগীদের প্ররোচনা দাতা গুরু।

উপজাতীয়দের দুর্বল রাজনৈতিক ভিত্তি হলো তারা বৃটিশ আমলের বহিরাগত অভিবাসী জন গোষ্ঠী, প্রশ্নাতীত ভাবে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা নয়। তাদের অভিবাসন এদেশবাসীর দ্বারা অনুমোদিত নয়। ১৯৭২ সালে অবাধ্যতার কারণে পাকিস্তান প্রদত্ত বিহারী অভিবাসন বাতিল হয়েছে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০/১ রেগুলেশন ভুক্ত ৫২ নম্বর অভিবাসন আইনটিও কার্যকর নেই। যেহেতু এই উভয় সম্প্রদায়ই দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে দেশকে বিচ্ছিন্ন আর অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাদান ও চুক্তি করা সত্ত্বেও বৈরী উপজাতীয়রা দেশের মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের বিতাড়নে এখনও সক্রিয় আছে। সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজী অব্যাহত রেখেছে। সেহেতু এই ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার শাস্তি হওয়া অন্যায় কিছু নয়। অস্ত্রবাজি গণহত্যা আর বাঙ্গালী প্রত্যাহারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এমন এক গুরুতর অপরাধ যার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও জাতি কর্তৃক তারা বৈরী ঘোষিত হতে পারে। তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কর্মসংস্থান রহিত, অভিবাসন ও নাগরিক অধিকার বাতিল হওয়া অন্যায় কিছু নয়।

এমন দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধের উপায় হলো : তাদের অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তৎপর আনুগত্যের প্রমাণ দেয়া, যাতে মানবতাবাদী সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর করা সম্ভব হয়। দেশ বৈরী এই অভিযুক্তদের বিদেশী শক্তির কাছে এমন সুযোগ লাভের জন্য তদবিরে সক্রিয় হওয়া ও সুফল লাভের অপেক্ষা করাটাও অপরাধ। বিদেশী মুরব্বী রাষ্ট্রসমূহ তাদের পক্ষে এসে হস্ত ক্ষেপ করবে, এই আশাবাদ ধৃষ্টতা।

বিহারী আর পার্বত্য বিদ্রোহী উপজাতীয়রা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বৈরীরূপে তাদেরকে পালন পোষণের কোনো সুযোগ নেই। অপরাধবোধ, দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনাতেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্র নিহিত। তাছাড়া তাদেরকে নাগরিক রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে অপরাধে অভিবাসী বিহারীরা দুর্ভাগ্যজনক শিবির জীবনযাপনে এখন বাধ্য, তার চেয়ে অধিক গুরুতর অপরাধে দ্বিতীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠী উপজাতীয়রা সমান শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তবে ক্ষমা ও মানবিক সেবা তাদের প্রাপ্য। সে জন্য তাদেরকে অপরাধবোধ দোষ স্বীকার ক্ষমা প্রার্থনা ও আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হতে হবে। কোন ক্রমেই অযাচিতে ক্ষমা আর সুবিধাবাদ মঞ্জুরযোগ্য নয়।

পার্বত্য চুক্তি একটি বিরাট উদারতা, উপজাতীয়রা যার অপব্যবহার করছে, বাংলাদেশ তার অসহায় অনুকারক। এর নেতিবাচক প্রভাব অবশ্য বিবেচ্য। চুক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গিকার হলো বাংলাদেশ সংবিধান অনুসরণ। অথচ প্রথম দফাতেই তা লঙ্ঘনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই লঙ্ঘনকে উভয় পক্ষের কেউই আমলে আনছেন না। তাতে চলমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতেই সব অসাংবিধানিক চুক্তি বিধিবিধান ক্রিয়া প্রক্রিয়া আপনা আপনি রহিত ও বাতিল হয়ে গেছে, যথা : অনুচ্ছেদ নং-৭ (১) ও (২), ২৬ (১) ও (২)। চুক্তিতে সংবিধান আর অলঙ্ঘনীয় অন্যান্য মৌলিক অধিকার আইনগুলো পর্যন্ত অক্ষুণ্ন নেই। রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র বিধৃত ধারা নং-১ এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত ধারা নং-৫৯ চুক্তি ভুক্ত আইনে বিকৃত হয়েছে। অথচ কোন কর্তৃপক্ষই এরূপ করার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত নন। এটি যথেচ্ছাচার।

মনে হয় ক্ষমতার শীর্ষাসীন ব্যক্তিরা পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয়দের নিয়ে বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এ অবাঙ্গালীরা অস্থানীয় না স্থানীয়, দেশীয় নাগরিক না বিদেশী বংশোদ্ভূত, এ ব্যাপারে তাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। তাই তাদের দ্বারা বৈরী উপজাতীয়দের নিয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে না।

এমনটি হওয়ার মূল কারণ ধরণা ও তথ্যগত অজ্ঞতা অবশ্যই। উপজাতীয়দের ধারণা ও কার্যক্রম চরমপন্থী। তারা পার্বত্য অঞ্চলকে বাঙ্গালী মুক্ত আর নিজেদের প্রশাসিত রাজ্যে পরিণত করতেই আগ্রহী। বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা মোতায়েনকেও তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ভাবে। জনপ্রাধান্য ও বর্ধিত সুযোগ সুবিধা বলে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পথেই তারা অগ্রসরমান। এই এলাকা চিরকালীন বাংলা অঞ্চল, যার আদি অধিবাসী হলো চট্টগ্রামী মূলের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী। দুর্গম পাহাড় ও বনাঞ্চল এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চল থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। সরকারও এতদাঞ্চলকে জাতীয় বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করে এতদাঞ্চলকে করে রেখেছে জনবসতি মুক্ত। এই সুযোগে সীমান্ত দেশীয় জুমজীবী উপজাতীয় লোকেরা কেবল বর্ষাকালে ভ্রাম্যমান জুম কৃষিতে এতাদঞ্চলে নিয়োজিত হতো এবং পরে ফেরতও চলে যেত। তারা ছিল বহিরাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। এখনো তাদের মূল জাতি ত্রিপুরা মিজরাম ও আরাকান অঞ্চলের স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বসবাস করছে এবং ঐ তিন এলাকাই তাদের চিরকালীন জাতীয় অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো তাদের একদল শরণার্থী লোকের অভিবাসিত এলাকা। এখনকার স্থানীয় উপজাতীয়রা ঐ শরণার্থীদেরই বংশধর। স্থানী-য়ভাবে তাদের আদি ও স্থায়ী সংখ্যাগুরু হওয়ার দাবী সঠিক নয়। এই লোকজনদের পিতৃপুরুষদের আদি স্বদেশ ত্যাগ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ এবং পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন ১৯০০/১ এর অভিবাসন আইন নং-৫২ বলে এই অঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, যা এদেশবাসী কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সেই ঔপনিবেশিক দখল, শাসন ও বিধি ব্যবস্থার কোন স্থায়ীত্বও নেই। স্বাধীনতার পর সে পরিস্থিতিও বিদ্যমান নেই। নিজেদের স্থানীয় ক্ষমতা বলে সেই অতীত বিদি ব্যবস্থা বিলোপের অধিকার বাঙ্গালীদের অবশ্যই আছে। এখানে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য হলো সংশ্লিষ্ট লোকজনের শান্তি অনুসরণ না করা, আনুগত্য হীনতা অবলম্বন, মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জ করা, এগুলো কোনো মতেই

অবহেলা যোগ্য নয়। নতুবা তাদের পক্ষে বাঙ্গালী মন জয় করা অসম্ভব হতো না। এমনটি করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিলো। নিজেদের সে কর্মফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বাঙ্গালী মানেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র। বাংলাদেশী জাতি তথা বাঙ্গালী ছাড়া এ দেশ ও জাতি কল্পনীয় নয়। এই নাম বিধৃত লোক সত্তা ও পরিবেশই এই দেশের জাতি শক্তি ও অস্তিত্বের ভিত্তি। এই মৌলিকত্বের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থাকা প্রশ্নাতীত। খাঁটি বাংলাদেশী হওয়ার উপায় এই আস্থা ও আনুগত্যের প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত হওয়া। এই সন্দেহটি মূলতঃ অতীত ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত, যা এ পর্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত পর্যালোচিত ও অধিত হয়নি। এই তথ্য শূন্যতাকে দখল করে নিয়েছে কিছু আজগৌবী উপজাতীয় কথা' কাহিনী, রূপকথা ও বানোয়াট গাল গল্প, যার বক্তব্য হলো উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের তিন রাজ পরিবার মূলত তিন স্থানীয় শাসক, বাঙ্গালীরা এখানকার স্থায়ী আদি বাসিন্দা নয় বহিরাগত। উপজাতীয়রা সরল নিরীহ বিধায় বাঙ্গালীদের দ্বারা ঘোষিত আর নির্যাতিত। তারা আত্মরক্ষার্থেই অস্ত্র ধারণে বাধ্য হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, নিজেদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা। এর লক্ষ্য অবাধে বাঙ্গালী উচ্ছেদ নয়।

এখানে এ প্রশ্নগুলোর যথার্থতা যাচাই হওয়া আবশ্যক। নয়তো বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীরা অপরাধী হয়ে থাকবে। প্রকৃত পক্ষে নির্দোষ ও নিরপরাধ কে? বাঙ্গালী বাংলাদেশ না উপজাতীয়রা? এ প্রশ্নে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত বিভ্রান্তিকে তাত্ত্বিকভাবেই কাটান জরুরী। দেশবাসী সাধারণ লোকতো বটেই, জ্ঞানী গুণীদের বিপুল সংখ্যক লোক পর্যন্ত এই প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত নন। বিদেশীরাও এই বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এই লোকজনদের ধারণা : স্থানীয় সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতি সত্তা সমূহ স্থানীয়ভাবে শান্তিতে নেই। বাংলাদেশে তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারে ঘাটতি আছে। যে জন্য তারা অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ। তারা প্রকৃতই বাংলাদেশী তবে অধিকার বঞ্চিত সংখ্যা লঘু। এদের পৃষ্ঠপোষণ দরকার।

এ কারণেই উপজাতীয় সংখ্যালঘু প্রশ্নে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চাপাধীন আছে। সুতরাং তাকে তথ্যগতভাবে আগে দেশে বিদেশে দায়মুক্ত হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয় লোক সংক্রান্ত তথ্যচর্চার ব্যাপারে বাংলাদেশ উদাসীন। তাকে প্রমাণ করতে হবে এই লোকজনেরা বৃটিশ আমলেরই বহিরাগত শরণার্থী বংশধর, স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ১৯০০ সালের পরে রচিত ও জারীকৃত পার্বত্য শাসন আইনের ৫২ ধারাই তাদের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণের আইনী প্রমাণ, যে আইন দেশীয় নয়, ঔপনিবেশিক।

ঔপনিবেশিক দখল ও রাজ্য বিস্তার, বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল ও লোক বিতাড়ণ, দক্ষিণ পূর্ব বাংলা অঞ্চল চট্টগ্রামে ঐ আরাকানী শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচ্য। ঐ লোকগুলো লুসাই, ত্রিপুরা, চাকমা, মগ ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত। ঐ আগ্রাসন ও উদ্বাস্তু জনিত বিরোধ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বার্মার মধ্যকার ১৮২৪ সালে সংগঠিত যুদ্ধে পরিণত হয়। তাতে আরাকান ও আসাম, বৃটিশ দখলাধীন হয়। এবং বার্মা, আসাম, আরাকান ও বাংলা হয়ে যায় একক বৃটিশ শাসনাধীন উপনিবেশ, যার অধিবাসীরা বৃটিশ.প্রজা। এই বৃটিশ প্রজা হওয়া সূত্রে ভারতীয় বর্মী আসামী আরাকানী বাঙ্গালী আদিবাসী উপজাতি ইত্যাদি পরিচয়ের মৌলিকত্ব

ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। পরে আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দেয়া হলেও, একক বৃটিশ শাসনের ঘোলাটে পরিস্থিতির অবসান ঘটেনি। বার্মা, আরাকান, আসাম ও বাংলাদেশ স্বতন্ত্র হলেও এসবের অধিবাসী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী অভিবাসন ত্যাগ করে স্বদেশে ফেরত যায়নি। এরই ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রিপুরা, লুসাই, আরাকানী, মগ, চাকমা, বার্মী ও ভারতীয়রা স্থায়ী হয়ে পড়েছে। এতদাঞ্চলে তারা সংখ্যা গুরুও বটে, যার ফলে তারা এখন স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীদার। তবে বাংলাদেশের প্রধান জাতি বাঙ্গালীদের বৈরী ভাবায় এ অধিকারগুলো তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য।

আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য স্বতস্ফূর্ত। স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক মিশ্র পরিচয়ের অবসান ঘটেছে। এমন বর্মী আদিবাসী, উপজাতি আসামী মগ, চাকমা, বাঙ্গালী ইত্যাদি স্বতন্ত্র পরিচয় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। লোকদের ভিন্ন অবস্থান ভিন্ন অঞ্চলে অনাকাঙ্খিত হওয়া শুরু হয়েছে। এই বিরূপ পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজেদের আমলেই বহিরাগত প্রীতি ভাজনদের অভিবাসনের ছত্রছায়া দান করেন এবং অনেককে আবাসন গড়ে দিয়ে যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম এরূপই এক বহিরাগত উপজাতীয় উপ-নিবেশ। উপজাতীয় রাজনৈতিক দাবীর কৃত্রিমতার ইতিহাস বার্মা আরাকান ও বৃটিশ দলিল পত্রের মাধ্যমে এখনো জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। এখানে ঐ অতীত ইতিহাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং বিদ্রোহী উপজাতিদের প্রকৃত ইতিহাস অবহেলা করা হয়েছে। অথচ বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুতর। উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি বাসিন্দা ও সংখ্যাগুরু মান্য হলে, এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, তাদের নিজেদের এই আবাস ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দুষ্প্রাপ্য নয়। এই অঞ্চলে বাঙ্গালী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধে বাঙ্গালী বিতাড়ন ও নির্মুলকরণ আন্দোলন, তাই ঐ উপজাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারেরই অংশ। সুতরাং বিপদকে ঘনিয়ে তোলার পরিবর্তে উপজাতীয়দের দাবীকে হাল্কা করতে হবে। বাংলাদেশের অমোঘ অস্ত্র হলো ইতিহাস। তাতেই প্রমাণিত তারা বিদেশী বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠী। স্বশাসন স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য নয়। বিদ্রোহজনিত অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া তাদের রেহাই নেই। চুক্তি সম্পাদন নমনীয়তা প্রদর্শন ও বিভিন্ন অধিকার প্রদান বিরোধীয় বিষয় নয়। এগুলো নাগরিকদের প্রাপ্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। বিদ্রোহীরা তার সুবিধা পেতে পারে না।

উপজাতীয়রা চরমপন্থী। তাদের ৫ দফা দাবী নামার দফা নং ৩(১) ৪ক ও খ-তে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা গুরুতর আপত্তিকর ও ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং অনাকাঙ্খিত। এই উচ্চাকাঙ্খার বিষয়ে বাংলাদেশের নমনীয় হওয়া মানে নিজের সর্বনাশ সাধন। দাবীটি যে কী সর্বনাশা তা তার ভাষ্যেই বিধৃত, যথা :

"দাবী নং ৩(১) ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭ হইতে বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়ই বিভিন্ন স্থান ও গুচ্ছ গ্রামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া।

৪(ক) ঃ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বিডিআর) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনা নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

৪(খ) ঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধাবস্থা কিংবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনা বাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনা নিবাস স্থাপন না করা।

এই দাবীগুলো চরম বিদ্রোহাত্মক। একে পাকাপোক্ত করেছে সশস্ত্র কার্যক্রম। এই বিদ্রোহী অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে বুঝতে দেয়া উচিত : তাদের প্রাপ্য হলো চরম শাস্তি। প্রথমতঃ তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তার বিপন্ন শিশুকালে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের প্রচুর প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটিয়ে তাদের স্বদেশের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়ণে সচেষ্ট। এবং সর্বেপরি তারা বিদেশগত অভিবাসী লোক, আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। এই ইতিহাসকে পাল্টে তারা এই অঞ্চলে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। সুতরাং তাদেরকে দমিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। এর বিকল্প হলো : তারা দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নতুবা তাদের জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত.

অবাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা, ধারণা ও তথ্যগতভাবে, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী বিরোধী। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার লক্ষ্য অর্জনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪টি সশস্ত্র বিদ্রোহ। তাদের প্রতি চরম উদারতা ও নমনীয়তার উদাহরণ হলো আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত পার্বত্য চুক্তি। তবু তারা তাতেও সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ বলা যায় না। সব দান, অনুদান, দয়া দাক্ষিণ্য, অগ্রাধিকার ও ক্ষমাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। বড় বড় গাড়ি বাড়ি, মাসোহারা বৃথাই বিলান হচ্ছে। এর অর্থ হলো বিষয়টির প্রতি রাষ্ট্রীয় ও বহিরদেশীয় মূল্যায়ন সঠিক নয়। উপজাতি সংক্রান্ত পূর্ব আশাবাদ ধ্যান ধারণা ও তথ্য ভিত্তি ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটাই সঠিক তথ্য যে, পার্বত্য উপজাতিরা স্থানীয় আদিবাসিন্দা নয়। ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটিশদের দ্বারা তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত, যথা হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০/১ ধারা নম্বর ৫২, এবং ব্রিটিশ বার্মা যুদ্ধ ১৮২৪ এর কার্যকারণ সমূহ। এখন ধারণা ও তথ্যগত ভুল সংশোধন আবশ্যক। তাহলেই উপজাতিসহ দুনিয়াবাসী প্রকৃত ভুলের ব্যাপারে সচকিত হবে, এবং এ ধারণাও জন্ম নিবে যে উপজাতিদের রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের স্থানীয় সংখ্যা প্রাধান্য উদ্বাস্তু সমস্যাজাত কৃত্রিম। বাংলা রাষ্ট্র পক্ষের দুর্ভাগ্য যে সঠিকভাবে উপজাতীয় অতীত সন্ধান করা হচ্ছে না। এর ভিতর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক গিরিদর্পণ ভিত্তিক কিছু ধারাবাহিক তথ্যালোচনা, যার লেখক এই অভাগা ব্যক্তি, যিনি অশেষ দুঃখ কষ্ট অনুসন্ধান ও অভাব অসুবিধার ভিতর প্রতিপক্ষের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে স্বদেশ স্বার্থকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এই পরিশ্রমের বিপুল আর্থিক মূল্য তো আছেই, তবে তার ব্যয় নির্বাহে দেশ ও জাতির কোন অবদান নেই। এই সব তথ্য উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে জাতি ও দেশ পার্বত্য সংকট থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে। জাতি ও দেশে এই তথ্য উপাত্ত যথার্থভাবে মূল্যায়িত হলে প্রতিপক্ষ নীতিগতভাবে দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। তাই চলমান পার্বত্য সংকটের সমাধানের পক্ষে তথ্য উপাত্তের চর্চা যথার্থ মূল্যায়ন ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের পক্ষে প্রথম সাহসী পদক্ষেপ হলো পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় সাহসী পদক্ষেপ হলো ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের দাবী বাস্তবায়ন। তৃতীয় সাহসী পদক্ষেপ হলো ঃ পাকিস্তানী দোসর বিহারীদের বৈরী ঘোষণা ও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল ও ক্যাম্পে আবদ্ধকরণ। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আর বাঙ্গালী আধিপত্য তৎপর ও বিপদমুক্ত হয় নাই। চাকমাসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কিছু উচ্চাভিলাষী লোক বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী বৈরীতায় তৎপর। তাদের বিদ্রোহ দমাতে জরুরী হলো চতুর্থ সাহসী পদক্ষেপ, যদ্দরুণ স্থাপিত হয়েছে সেনা নিবাস, এবং তারই পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে ভূমিহীন বাঙ্গালীদের আবাসন। কিন্তু এই শেষ দুই পদক্ষেপের পক্ষে অনুকূল তথ্য উপাত্তের চর্চা প্রয়োজনীয় ছিল যার প্রতি সরকার ও জাতি উদাসীন। বিপরীত ভুল তথ্য উপাত্তকেই অবলম্বন করে বিদ্রোহী উপজাতিরা শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে এবং দেশে বিদেশে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী সমর্থিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তি হলো এই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ফয়সালা, যার সুফল শূণ্য।

কোন চুক্তি ও সুযোগ সুবিধাতেও উপজাতীয়রা সন্তুষ্ট নয়। তারা এ পর্যন্ত ৪ বার সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। শিশু বাংলাদেশকেও তারা রেহাই দেয় নি। তাদের এই অব্যাহত অবাধ্যতাকে আর অবহেলা করা যায় না। এরা বিহারীদের মত অবাধ্য দ্বিতীয় শরণার্থী বংশধর। গণহত্যা ও বিদ্রোহের কারণে এদের বৈরী ঘোষণা, নাগরিকত্ব বাতিল, বিচারে সোপর্দ ও ক্যাম্পে আটক করা আবশ্যক। একমাত্র তাতেই তারা নিজেদের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে।

পার্বত্য চুক্তি ও তৎসৃষ্ট সুযোগ সুবিধা এই উপজাতীয় অপরাধীদের বাগে আনতে সক্ষম হয়নি। এখন আরো অধিক অপেক্ষা করা বৃথা।

সরকারের নমনীয় তোষামোদ মূলক পার্বত্য নীতির ভুল ও ব্যর্থতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এই ভুরের মূল কথা হলো বিদ্রোহী উপজাতীয়রা আসলে স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়, তারা বহিরাঞ্চলীয় শরণার্থী বংশধর। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০/১ এর ৫২ ধারাতে তাদের অভিবাসন চিহ্নিত। ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ তাদেরকে ভোটাধিকার দান করেনি। সেহেতু ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ এর ভারত ব্যাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই বিদ্রোহী উপজাতিদের স্থানীয় আদি নাগরিক হওয়ার দাবী ভুল। দুনিয়াবাসীদের এই তথ্য জানতে দেয়া হচ্ছে না, এবং আমরা নিজেরাও তৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র অস্থানীয় হওয়ার তথ্যই বিদ্রোহীদের দমিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সরকার স্থানীয় ইতিহাস উদ্ধার ও প্রচারে মোটেও সক্রিয় নন। এই শূন্যতা পূরণে ব্যক্তি পর্যায়ে এই অধম কিছু ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছি। আমার লেখা প্রবন্ধ কলাম প্রতিবেদন বই পুস্তক সীমিত আকারে হলেও গত অর্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ এই ধারণা দিয়ে যাচ্ছে যে, উপজাতীয় উচ্চাভিলাষীদের প্রচারিত রাজনৈতিক ধ্রান ধারণা ও প্রচলিত তথ্য উপাত্ত বিভ্রান্তিকর। স্থানীয় প্রকৃত তথ্য তা থেকে ভিন্ন, যা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী স্বার্থের অনুকূল।

আমি স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য প্রচারে কোন রূপ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাইনি। অথচ এই ইতিহাসের প্রকৃত উপকার ভোগী আমি ব্যক্তি নই, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি। আমার জীবনের সমুদয় সঞ্চয় ও উপার্জন এবং কর্মক্ষম সারাটি জীবন একাজে ব্যয় করেছি। এই শ্রমের আর্থিক

মূল্য অবশ্যই বিরাট। আমার এই ত্যাগ ও দেশ প্রেম কর্তৃপক্ষীয় পর্যায়ে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি নিজেও তাতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এক অপগণ্ডে পরিণত। বিপরীতে বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ মোটা অংকের বেতন ভাতা দামী গাড়ী বাড়ী আর উঁচু পদমর্যাদা ভোগ করছেন। শান্তি তবু সদূর পরাহত।

অর্থকড়ি আর প্রকাশনার অভাবে পার্বত্য সংকট মূল্যায়ন মূলক আমার লেখাগুলো ব্যাপক প্রচারের সুযোগ পায় নি। সরকার এই মুফত মূল্যায়নটি নিজস্বার্থে কাজে লাগাতেও সক্রিয় নন।

সত্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এদেশের কোন উপনিবেশ বা সংযোজিত অঞ্চল নয়। এবং বাঙ্গালীরাও এই অঞ্চলসহ গোটা বাংলাদেশের মূল স্থায়ী বাসিন্দা। বিপরীতে এতদাঞ্চলে উপজাতীয়রা বৃটিশ আমলের বহিরাগত অভিবাসী। বহিরাগমনের দ্বারা উপজাতীয়রা এখন স্থানীয় ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলেও, রাজনৈতিক মর্যাদায় তারা অস্থানীয় সংখ্যালঘু। দেশের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙ্গালীদের এতদাঞ্চলে বসবাসের অধিকার মৌলিক, এবং এটি বাংলাদেশের আদি ও অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। সংখ্যালঘু বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠী ভুক্ত লোকদের এতদাঞ্চল থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগ দাবী, তথা স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রনমূলক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, দেশ ও জাতি বিরোধী অপচেষ্টার শামিল। এদের দমিয়ে দেয়া জাতীয় কর্তব্য। এই রাষ্ট্রদ্রোহী ও জাতি বিধ্বংসী তৎপরতা মোটেও সহনীয় নয়। এটা মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রূপেও মান্য নয়। বাংলাদেশে একক ভাবে বাঙ্গালীরাই মূলত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জাতি। এটা উদারতা যে স্থানীয় অবাঙ্গালী সংখ্যালঘুদের অন্ত র্ভুক্ত করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে কোন বহিরাগত অবাঙ্গালী লোকের জাতি ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম সহ্য করা হবে। এ দেশে সমানাধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পূর্ব শর্ত হলো তারা নিজেদের অভিবাসী সংখ্যালঘু মানবে, রাষ্ট্র ও বাঙ্গালী বিরোধী কোন অপতৎপরতায় জড়াবে না। কোন রূপ আধিপত্য, অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ও বাঙ্গালী বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবে না। এর নিশ্চয়তা হিসেবে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হবে যে সমুদয় উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন বিলুপ্ত হলো, অতীতের সমুদয় হানাহানি সহিংসতা আর বিভেদ অপরাধমূলক বিদ্রোহাত্মক কার্যক্রম। তজ্জন্য দেশ ও জাতির কাছে তারা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। সাধারণ উপজাতীয়রা দেশদ্রোহী, গণহত্যাকারী ও যুদ্ধপরাদের মত দুষ্কর্মের হোতাদের আইন সঙ্গত শাস্তি বিধানে সম্মত।

উপজাতীয় পাড়া প্রধান কারবারী, হেড ম্যান, রাজা, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, পৌরসভা সদস্য ও চেয়রম্যান, উপজেলা ও জেলা পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, স্কুল কলেজের কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষক ইত্যাদি গণ্যমান্যদের একত্রিত হয়ে উপরোক্ত ঘোষণ পত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর দিতে হবে। তৎপর কেবল দেশ ও জাতি দ্রোহী অপরাধী বিপদজ্জনক ব্যক্তিদের সংশোধনাগারে আবদ্ধ করা হবে। অভিযোগ থেকে সাধারণ নিরীহ লোকেরা রেহাই পাবে নির্বিচারে সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। বৈরী ঘোষিত চিহ্নিত অপরাধীরা বিচারে সোপর্দ হয়ে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশদ্রোহমূলক অপরাধ ক্ষমারযোগ্য নয়।

নির্বিচার উদারতা বাংলাদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অপরাধের বিচার ও শাস্তির উদাহরণ অবশ্যই স্থাপিত হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় স্বদেশ ভূমি নয়। ত্রিপুরাদের জাতীয় স্বদেশ ভূমি ত্রিপুরা রাজ্য, লুসাই বা মিজোদের জাতীয় স্বদেশ ভূমি মিজোরাম, মগ, মারমা, রাখাইন ইত্যাদির জাতীয় স্বদেশ ভূমি আরাকান ও মিয়ানমার, চাকমা তঞ্চগ্যা ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও জাতীয় স্বদেশ ভূমি আরাকান সহ সীমান্তবর্তী বহিরাঞ্চল। এই অভিবাসী বিদেশী বংশধরদের এতদাঞ্চলে স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর কোন মৌলিক ভিত্তি নেই। স্বদেশ ভূমির একাংশ পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার দাবী করা, তদজ্জন্য তাদের উপর আক্রমন অত্যাচার ও দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক প্রচেষ্টা চূড়ান্ত দুষ্কর্ম। উপজাতিদের এ কাজগুলো পুরস্কার যোগ্য নয়। অথচ তথাকতিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি এমনই এক পুরস্কার ব্যবস্থা। দেশ জাতি ও বহিরবিশ্বের তৎপ্রতি সমর্থন দান প্রহসন বিশেষ। তবে সৌভগ্যের কথা চুক্তিটি সরকার সমর্থিত হলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নয়। এই চুক্তি গণহত্যা আর দেশদ্রোহকে ক্ষমাযোগ্য করেনি। দোষ স্বীকার ক্ষমা প্রার্থনা আর আনুগত্যের অঙ্গীকার ছাড়া উপরোক্ত অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ভুক্ত করা যায় না। অপরাধীদের উচ্চপদ, বেতন বাতা, দামী গাড়ী বাড়ী ইত্যাদির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা ও পালন পোষন কার্যতঃ অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা। এ পর্যন্ত তাতে কোন সুফল ফলেনি। পর্বতাঞ্চলেও শান্তি আসেনি। হালের ঘটনা হলো ক্রস ফায়ারে অসংখ্য দুস্কৃতিকারীর ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে, জঙ্গীরা ফাঁসি কাঠে ঝুলছে, আর দুর্নীতিবাজ হুমরা চুমরা রাঘব বোয়ালরা শাস্তি পাচ্ছে ও জেল খাটছে। এমতাবস্থায় উপজাতীয় দেশদ্রোহী দুস্কৃতিকারীরা জামাই আদর পাচ্ছে, এটা ভুল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা ক্ষমতাসীনদের জন্য এটা এক দূর্ভাগ্যজনক উদাহরণ।

পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতারা অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী দেশদ্রোহী ও গণহত্যার হোতা। পাহাড়ী বাঙ্গালী হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ লোককে তারা হতাহত উচ্ছেদ ও নিঃসম্বল করেছে। বাংলাদেশের ৯৯% অধিবাসী বাঙ্গালীরা এদেশের স্থায়ী ও আদি অধিবাসী। পার্বত্য উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়, বহিরাগত। এই ইতিহাসের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির নেতারা বাঙ্গালীদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহিস্কার দাবী করে, যা জঘন্য অপরাধ। গণহত্যা মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশদ্রোহ, আর বাঙ্গালী বিতাড়ন দাবী অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। এটা বিনা বিচার ও শাস্তিতে পার পেতে পারে না। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধারা নম্বর ৫২ তাদেরকে বহিরাগত অভিবাসী রূপে চিহ্নিত করেছে। বৃটিশের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অনুমোদিত সাধারণ নির্বাচনে ভারতব্যাপী ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে প্রদেশ ও কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিরা ছিল সে সময় ভোটাধিকার বঞ্চিত। ভোটাধিকার বঞ্চিত উপজাতীয়রা তখন তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেনি। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভাবা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা তখন স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দারূপে গণ্য ছিলো না। তাই তাদের ভোটাধিকার হীন রাখা ছিল যথার্থ। এই মূল্যায়নটিকে মৌলিক ও যথার্থ ভাবা যায়, যা এখনো প্রয়োগ ও প্রবর্তন যোগ্য। তবে পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই মূল্যায়নটির

ব্যতিক্রম করে পার্বত্য উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দান করা হয়, যা যথার্থ ছিল না যা এখন প্রত্যাহার যোগ্য। এখন পাকিস্তান আমলের ভোটাধিকার দানকে অব্যাহত রেখে উপজাতীয়দের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা একটি ভুল। এখন এর সংশোধন করা আবশ্যক। এই ভুলেরই প্রতিফল হলো আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে জনসংহতি সমিতির বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের অধিকারকে অস্বীকার, পর্বতাঞ্চলে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

বিদ্রোহী উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দানের ভুলকে উদারতা ভাবা হলেও, তাতে কোন সুফল ফলেনি। এটি হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে আত্মহননের শামিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে চাকমা প্রধান ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন এবং ১৮৩০ জন উপজাতীয় রাজাকার ও সিভিল ফোর্সের সশস্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা ও তৎপর সশস্ত্র বিদ্রোহ আর গণহত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ অপরাধের জন্যই অভিবাসী বিহারীরা এখন বৈরী ঘোষিত ও শিবিরবাসী হয়ে দূর্ভাগ্যজনক বন্দি জীবন যাপন করছে। বিদ্রোহী উপজাতীয়রাও এরূপ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ভুল স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে দেশ ও জাতির অনুকম্পা লাভের সুযোগও তারা নেয়নি। সরকার অযাচিতেই যুদ্ধাপরাধী ত্রিদিব রায়ের অন্যতম পুত্র দেবাশীষ রায়কে উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করেছেন। এই উদারতা ও অনুকম্পার প্রতিদান রূপে তিনি বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। এই দুস্কর্মসমূহের প্রতিবিধানে আবশ্যক হলো সব অনুকম্পা ও উদারতা রদ করা, শান্তি চুক্তি রহিত করা, অগ্রাধিকারমূলক সব ব্যবস্থাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ রহিত করা, এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী উপজাতীয় ভোটাধিকারের অবসান।

উপজাতীয় দুস্কৃতিকারীদের অপরাধ বোধ না হওয়া এবং জাতি ও দেশের কাছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা, দূর্ভাগ্যজনক। সেদিন অবশ্যই আসন্ন, যেদিন উপজাতীয়রা নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য বৈরী ঘোষিত ও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং শাস্তি পাবে। জাতি ও দেশের পক্ষে সে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী, রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট।
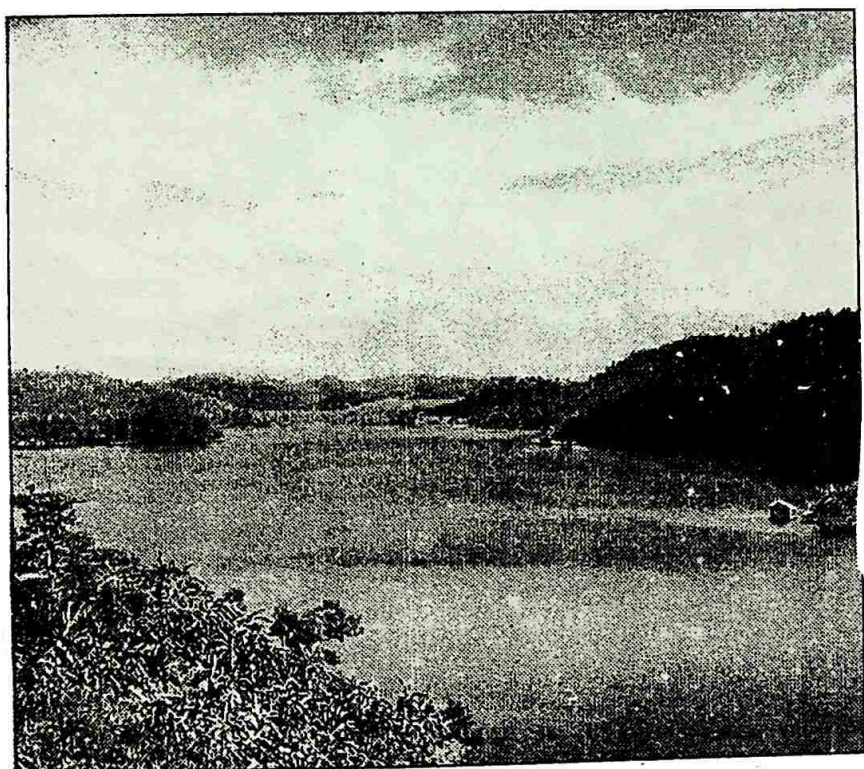
পাহাড় ও হ্রদ
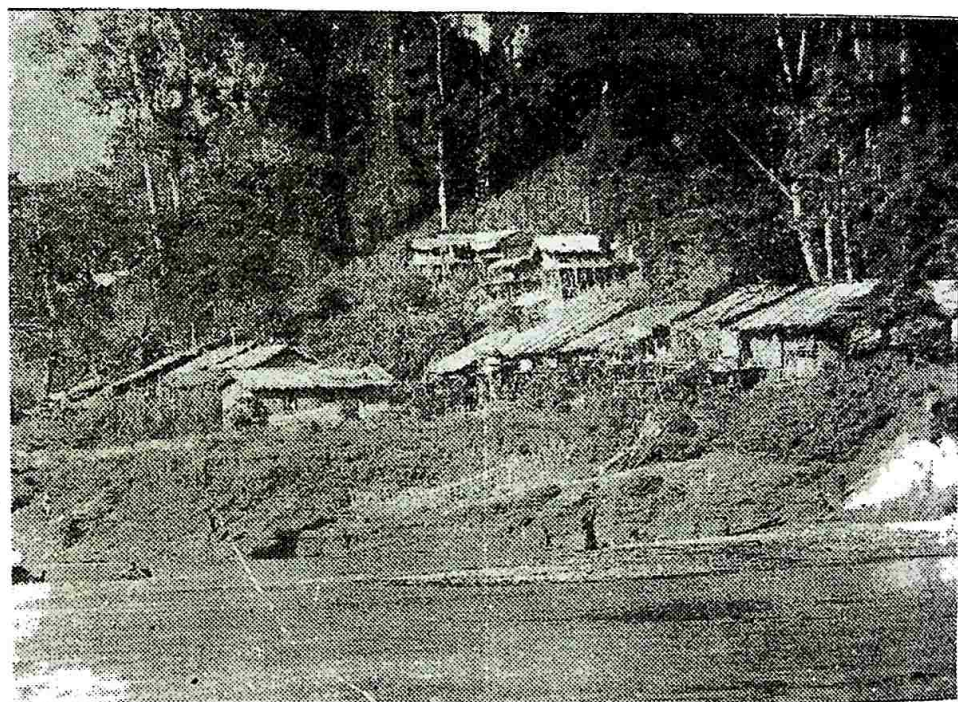
পাহাড়াভ্যন্তরে উপজাতীয় পাড়া

০১. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও উপজাতীয় ইতিহাস

কিছু শ্রদ্ধেয় উপজাতীয় পন্ডিত অযথাই উষ্মা প্রকাশ করেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীরা আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, এবং আর্মি ও প্রশাসন তাদের মদদ যোগাচ্ছে, যথা ঃ

"স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল ভূমির লোকদের আগমন বেড়ে যায়। .... ভাগ্যের অন্বেষনে আসা সমতলভূমির এসব লোকজন প্রথমেই স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিচিত হয়ে ব্যবসার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এদের কেউ কেউ অত্র অঞ্চলে পশ্চাদপদ, বঞ্চিত ও শোষিত জনগোষ্ঠির সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলেও নাম লেখান। ......

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী সমতল ভূমির এই বাসিন্দারা এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য তথা পুরা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ক্ষেত্র ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছেন। সংবাদ পত্রের মালিক, সম্পাদক এবং সাংবাদিক ও এরাই। এরাই সংবাদ পত্রে কলাম লেখক, উপজাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গবেষক।। এদের দু'একজন শেষপর্যন্ত নিজেদেরকে ইতিহাসবিদ হিসাবেও দাবী করছেন। ...... তাদের গবেষণার মুল বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী, এই বিষয়ে ইতোমধ্যে দু'একটি বই প্রাশিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাসিন্দারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা বা আদিবাসী নহে, সে কথাই উপরোক্ত বইগুলোতে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। .... কিছু লোক ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়ে, শেষ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে উপজাতীর ইতিহাস গবেষণার নামে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারনার কাজে লিপ্ত হয়েছেন"। (সূত্রঃ সাময়িক পত্র ঃ সুবলং বৈসাবী সংখ্যা ২০০০ প্রতিবেদক বাবু জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা)।

এই বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তার পাশাপাশি ঐ পন্ডিত উপজাতীয় ইতিহাসের ভ্রান্তিপূর্ণ কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যা তথ্যানুরাগীদের বিভ্রান্ত করবে। তার জানা থাক ভাল যে

আই,এল,ও কনভেণশন ১০৭ ও ১৬৭ অনুযায়ী নিজ নিজ জাতীয় আবাসভূমিতেই আদিবাসী সংজ্ঞা প্রযোজ্য। বাংলাদেশ পার্বত্য উপজাতিদের অভিবাসিত দেশ, মূল আবাসভূমি নয়। সুতরাং বাংলাদেশ কর্তৃক তাদের স্থানীয় আদিবাসী স্বীকৃত না হওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত।

রাজনীতিক সহ কিছু উপজাতীয় পন্ডিত বিকৃত ইতিহাস চর্চায় উৎসাহী, যা তাদের উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যেরই অনুসারী। অথচ তাদেরই লোকগীতি, স্মৃতিকথা পূরাতত্ব ইত্যাদি প্রমান করে, মাত্র বৃটিশ আমল থেকেই তারা এদেশে অভিবাসিত বাসিন্দা। তাদের বহিরাগমনের উপর সীলমোহর হলো পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ ধারা।

অধিকাংশ লোক, তথ্য চর্চা কালে একথা ভুলে যান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আসলে চট্টগ্রামেরই অংশ, যা ১৮৬০ সালে পৃথক জেলায় পরিণত হয়েছে, এবং চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী হলো এই উভয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। মৌলিকত্বের বিচারে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে চট্টগ্রামী মূলের লোকজনই মাত্র নিজেদের স্থানীয় আদিজন বলে দাবী করার হকদার। পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু আদি পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চল নয়, এবং এখনো চট্টগ্রাম নামেই পরিচিত, সেহেতু এই উভয় অঞ্চলের আদি মানব গোষ্ঠীর মৌলিক পরিচয় হবে চট্টগ্রামী। কিন্তু স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অদ্যাবধি কখনো এ দাবী করেননি যে, তারা চট্টগ্রামী মূলের লোক। সুতরাং তাদের স্থানীয় আদিবাসী, আদি বাসিন্দা বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আগে ইতিহাস ও যুক্তিতে স্থান করে নিতে হবে, নয়তো আই,এল,ও কনভেনশন ও কারো মুরব্বিয়ানা কোন কাজেই আসবে না।

১৯৯৩ সালের ১৪-২৫ জুন অনুষ্ঠিত ভিয়েনা মানবাধিকার কনভেনশনে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশে কোন আদিবাসী থাকার কথা অস্বীকার করেন এবং অদ্যাবধি তাই এদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি। এই অস্বীকৃতির বিপরীতে, স্থানীয় উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের উপস্থাপনীয় যুক্তি হবে, এমন সব তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন, যা প্রমান করবে যে, তারা ইতিহাস স্বীকৃত প্রকৃত স্থানীয় আদিবাসিন্দা ও আদিবাসী। জাতিগত ভাবে যদিও তাদের বহিরদেশীয় আদিবাসী বংশধর হওয়া অনস্বীকার্য্য। তাদের চট্টগ্রামী মূলের লোক দাবী না করার রহস্যটা অবশ্যই রাজনৈতিক এবং তা হলো স্বতন্ত্র জুম্ম জাতি সত্তার দাবী প্রতিষ্ঠা। এর ফল হলো এই যে, তারা আদি ও স্থানীয় বাসিন্দা রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

স্থানীয় উপজাতীয়দের একমাত্র যৌক্তিক জোর হলো, তারা পৃথক জেলাবাসী হওয়া অবধি স্থানীয়ভাবে সংখ্যাগুরু, এবং প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ভূমি প্রশাসন ও জন নিয়ন্ত্রণ ও তাদের অভিজাতদের হাতে ন্যাস্ত। এগুলো পৃথক রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রেও বটে। স্থানীয়ভাবে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও প্রচলিত আইন কানুন রদ করা মানে উপজাতীয়দের ঐ ক্ষমতা কেন্দ্রের বিলোপ সাধন, যা তাদের সাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের পরিপন্থী। এটা তাদের অসন্তোষের মূল কারণ। তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো বিজাতীয় আধিপত্য রোখা। তাদের দৃষ্টিতে বাঙ্গালী আধিপত্য ও ইসলামী অনুপ্রবেশেরই নাম উপজাতীয় বৈরীতা।

১/১৯০০ রেগুলেশন জারি হওয়া অবধি স্থানীয় উপজাতিদের স্থানীয় আদিবাসীরূপে স্বীকৃতি ছিলোনা। সুতরাং তখন পর্যন্ত তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বাঙ্গালীদের সাথে ছিলো তুলনার অযোগ্য। বিপুল সংখ্যা হওয়া সত্বেও ১৮৬০ পর্যন্ত অখন্ড চট্টগ্রামে, বাঙ্গালীদের তুলনায় তারা ছিলো সংখ্যা লঘু। কিন্তু জন বিরল পাহাড় ও বন অধ্যূষিত পূর্বাঞ্চল, পৃথক জেলা হওয়ার সুবাদে, রাতারাতি ঐ শরনার্থী বংশধর উপজাতীয়রা, স্থানীয়ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যায়। তার সাথে যুক্ত হয় অভিবাসনের স্বীকৃতি এবং স্থানীয় লোক প্রশাসন ও ভূমি প্রশাসনে অংশিদারিত্ব,যা ছিলো অযৌক্তিক। সর্বোপরি বাঙ্গালী নিয়ন্ত্রনে ব্যবহৃত হয়; অভিবাসন আইন, তাতে বাঙ্গালীরা বিদেশী বিজাতিরূপে বিবেচিত হয়।। এর ফলে তাদের আগমন ও বসতি স্থাপন সীমিত হয়ে যায়। সাথে সাথে উপজাতীয়দের অবাধ বহিরাগমন ও সংখ্যা বৃদ্ধিকে করা হয় উৎসাহিত। বাঙ্গালীদের উপর স্বদেশের ভিতর অভিবাসন আইন প্রয়োগ ছিলো অন্যায় এবং অবাধে উপজাতীয় অভিবাসন মঞ্জুর ছিলো অনভিপ্রেত। বৃটিশ শাসনের ষ্টীম রোলে, বাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠী ছিলো ভীত। তাই কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলনও হয়নি।

ঔপনিবেসিক ও খৃষ্ট ধর্মীয় স্বার্থে বৃটিশরা ছিলো বহিরাগত উপজাতীয়দের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিশীল। গায় পড়েই তাদের ভূমি দান ও ক্ষমতাশালী করার প্রক্রিয়া চলে। গড়ে তোলা হয় তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন সার্কেল ও মৌজা। সংখ্যায় অল্প বাঙ্গালীরা হয়ে পড়ে তাদের হুকুমবরদার প্রজা, এবং সহায় সম্পদ ক্ষমতা ও যোগ্যতায় নগন্য।

সেই বৃটিশ আমল থেকেই এতদাঞ্চলে একটি নীল নকসার রাজনীতি শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে আরাকান, লুসাই, পার্বত্য চট্টগ্রামও ত্রিপুরার সমন্বয়ে একটি স্বাধীন খৃষ্টান উপজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তখনই গৃহীত হয়। তাই খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্যোগও নেয়া হয়। এই লক্ষ্যেই লুসাই, ত্রিপুরা ও আরাকান বিজিত হয়, এবং এখন এই অঞ্চল সমুহে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী উপজাতীয়দের সংখ্যা বিপুল। তারা স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার ও পৃথক জাতিত্ব অর্জনের পথে আন্দোলনরত, যে আন্দোলন সময়ে সময়ে সশস্ত্র হয়ে ওঠে।

এটা দুঃখ জনক যে, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার ও জুম্ম জাতীযতাবাদকামী উপজাতীয়রা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে জুম্ম ল্যান্ড ও জুম্মজাতীয়তাবাদেরই প্রবক্তা। তাদের এই রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের গোপন অভিসন্ধি, দেশ প্রেমিক স্থানীয় বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী মহল প্রতিহত করে চলেছেন, তাই তারা এখন ঐ বাবুদের চক্ষু শূল।

স্থানীয় উপজাতীয় পন্ডিত মহল কিছু মুসলিম নাম খেতাবধারী সাবেক উপজাতীয় প্রধানদের নিজেদের রাজা বলে গর্বের সাথে উল্লেখ করে থাকেন। প্রয়াত চাকমা রাজা শ্রদ্ধেয় ভূবন মোহন রায়, স্বীয় পুস্তিকাঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসেও মুসলিম নাম খেতাবধারী বেশ কিছু পূর্ব পুরুষের উল্লেখ করেছেন। চাক্মা রাজবাড়িতে রক্ষিত কতিপয় সীল মোহরে আরবী অক্ষরে খোদাইকৃত কিছু চাকমা রাজ পুরুষের নাম খেতাবের উল্লেখ আছে। সে সবের একটিতে আছে ইসলাম ধর্মীয় বাক্যঃ রোমান আরাকান- আল্লাহু রাব্বি। শের জব্বার খান ১১১১। মঘী সন হিসাবে ঐ ১১১১ হলো ১৭৪৯ খ্রীঃ সাল।

এই সীল মোহর হলো ঃ অকাট্য ঐতিহাসিক উপাদান, তদ্বারা প্রমাণিত হয়; ঐ সীল মোহরধারী রাজা শের জব্বার খান ছিলেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিগত ভাবে মুসলমান ও আরাকানী। শের জব্বার খানের নিজের মুসলমান হওয়া প্রমান করে, তাঁর পরিবারভূক্ত উর্ধ ও অধঃস্তনরা ছিলেন বংশগতভাবে ঐ একই ধর্মের অনুসারী। নয়টি সীল মোহরের প্রতিটিতে আরবী হরফ ও প্রতি পুরুষের মুসলিম নাম ওখেতাব হলো একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য, যার সাথে অমুসলিম বৌদ্ধ সংস্কৃতির কোন সংশ্রব নেই। অথচ দাবী করা হয় চাকমাদের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও পৃথক লেখ শৈলী অতি প্রাচীন। বাস্তবে এসবই বানোয়াট।

রাজা জব্বার খান ও তদীয় পুত্র ধরম বখশ খানের সীল মোহরে হিন্দু দেব দেবীর চর্চা সংযোজিত হওয়ায় বুঝা যায়, তাদের মাঝে খানেক ধর্ম বিকৃতি ঘটেছিলো, তবু তারা ঐতিহ্যগতভাবে ছিলেন মুসলিম। বলা যায় ধরম বখশ খাঁ পত্নি কালিন্দি বিবির ১৮৫৭ সালে বৌদ্ধত্ব গ্রহনই তাদের ধর্মান্তর গ্রহনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা উত্তরাধিকারের মত রাজ পরিবার ও গোটা চাক্মা সমাজে সংক্রমিত হয়েছে। ঠিক এ কারনেই চাক্মা প্রতিষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ মন্দির হলো ১৮৬৯ সালে রাজানগরে কালিন্দী স্থাপিত মন্দির ও ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রাঙ্গামাটির আনন্দ বিহার। বালুখালির রাজবাড়িতে স্থাপিত রাজ মন্দিরটির স্থাপনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। রাজা নগর থেকে রাজবাড়ি বালুখালিতে স্থানান্তরিত হয় ১৮৭৩ সালে। তৎপূর্বে রাজবাড়ি ও চাক্মা বসতি প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ায় ছিলো, যেখানে স্থাপিত প্রাচীন ও প্রধান বৌদ্ধ মন্দির, মহামুনি বৌদ্ধ মন্দিরটির স্থপতি সমাজ হলো মগ ও বড়ুয়ারা। দ্বিতীয় প্রাচীনতম প্রধান মন্দির হলোঃ চিৎমরম বৌদ্ধ মন্দির, যার প্রধান স্থপতি সমাজ হলো মগেরা। সুতরাং চাক্মাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্য খুব প্রাচীন নয়। চাকমা রাজ সীল মোহরই প্রমাণ করে, তারা মুসলিম সমাজ থেকে বিবর্তিত। এ কারনেই তাদের ভাষা ব্যবহার আচার- আচরন নাম ও খেতাবে সে ঐতিহ্যের অবশেষ বিদ্যমান। হুজুর, সালাম, বিবি, খোদা, দোজখ, তালাক, খোদা-বান্দা ইত্যাদি শব্দাবলী, এবং দাজ্যা (দাড়িওয়ালা) ও চেক কাবা (চেট কাটা = খতনাকৃত) ইত্যাদি গোষ্ঠী গোত্রীয় নাম, মুসলিম ঐতিহ্যেরেই অবশেষ। রাজা ধরম বখশ খাঁর কন্যা চিকন বিবির বিবাহ অমুসলিম নাম ও খেতাবধারী গোপী নাথের সাথে ঘটায়, তৎ পুত্রের নাম রাখা হয় হরিশ্চন্দ্র। তিনি ১৮৭৩ সালে চাকমা প্রধান নিযুক্ত হোন এবং ইংরেজ প্রদত্ত রায় উপাধি গ্রহন করেন। সে থেকেই চাকমা প্রধানদের মুসলিম নাম ও খান খেতাবের ঐতিহ্য পরিত্যক্ত।

চাক্মা পন্ডিত মহলের বিভিন্ন; প্রবন্ধে ও লেখায় ভুল তথ্য প্রদান এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক উপাদানাদি উপেক্ষা করে ইতিহাস চর্চা করায়, নির্ভূল তথ্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে, আমার কলম ধরা। ভুল তথ্যের দ্বারা স্থানীয় উপজাতীয় বিদ্রোহ আর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে, যুক্তি-সঙ্গত করার অপকৌশলের পরিণতি হবে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, যার প্রতিবাদ করা আমার দেশ প্রেমের অংশ।

উপজাতি পক্ষের বিভিন্ন লেখায় স্ববিরোধী ও উল্টা পাল্টা তথ্যের সমাহার অনেক।

তৈন খাঁ ও তার বংশ ধররা চাকমা ছিলেন, এ তথ্য সম্বন্ধে ও বিভ্রান্তি ব্যক্ত হয়েছে। তাদের নাম খেতাবই তো বলে, তারা আলী কদমের তৈন ছড়া বাসী স্থানীয় মুসলিম অভিজাত ছিলেন।

বাংলার সুলতানী আমলের ইতিহাস পড়ে জানা যায়, গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫১২ খ্রীঃ সালে ত্রিপুরা রাজ ধন্য মানিক্যকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করেন। দক্ষিন চট্টগ্রামে তারই নিযুক্ত শাসক ছিলেন খোদা বখশ খাঁন, যার সদর দপ্ত র ছিলো আলী কদম। ঐ মুসলিম অভিজাতদের বংশধররা ঐ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বংশ বৃদ্ধি করেছেন, এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাসের ঐ তৈন খাঁ ও শের মস্ত খাঁ-রাই ঐ অভিজাত মুসলিম ঘরানার লোক হবেন, এবং স্থানীয় বাঙ্গালী অবাঙ্গালী জন-সাধারণ হয়ে থাকবেন তাদের প্রজা। চাক্‌মাদের মাঝে জনপ্রিয়তার সুত্রে তাদের চাকমা রাজা আখ্যায়িত হওয়া অসম্ভব নয়।

চাকমা ভাষা, ঐতিহ্য ও রাজকীয় সীল মোহরের প্রদত্ত অকাট্য তথ্য সূত্রের সাথে, আধুনিক যক্তি বিদ্যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষন যুক্ত করে, এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছা যায় যে, চাক্‌মারা একটি মিশ্র সম্প্রদায়, এবং তাদের অভিজাতরা ছিলেন প্রধানতঃ মুসলিম। এ সত্য কথন চাকমা বাবুদের পক্ষে অরুচিকর। তাই নিরপেক্ষ তথ্য পূর্ণ বক্তব্যে ও তাদের গায় জ্বালা ধরে। আমি ইতিহাসবিদ ও গবেষক কিনা, তা আমার রচনা ঐশ্বর্য্যেই প্রমানিত হবে। নির্বিচারে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপনকারী বলা, তাদের প্রতি বিদ্বেষেরই নামান্তর। উপজাতিরা কি কখনোই বাঙ্গালীদের স্বজন স্বদেশী ও স্বজাতি হবেন না ?

বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ লোকদের প্রতি জাত বিদ্বেষ অত্যন্ত ঘৃনিত কাজ। এই বাঙ্গালীরা তো উপজাতিদের গুরুজন। সুদুর অতীতকাল থেকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা তাদের সাথে পণ্য বেচা কিনা ও লেন দেনে জড়িত। এটা একটি উন্নত সেবা কাজ। সুঁই সুতা থেকে অলংকার পোশাক, ইলেকট্রনিক পণ্য, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি, প্রতিটি প্রয়োজনীয় পণ্য, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে উপজাতীয়দের হাতে পৌঁছে। উপজাতীয়রা তো কোন উন্নত ভোগ্য পণ্যই উৎপাদন করেনা। দা, কুড়াল, খন্তা, চামিচ, সুঁই সূতা, লাঙ্গলের ফলা, হুকার চিলিম ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও নিম্নমানের পণ্য সমাগ্রী তো বটেই প্রতিটি উন্নত ও কারিগরি পণ্যাদি আসবাব পত্র ইত্যাদি পর্যন্ত কিছুই উপজাতীয় করায়ত্ব নেই। বাড়িঘর, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, পণ্যাদি বিপননের ব্যাপার গুলোতেও উপজাতীয়রা অজ্ঞ। অতীতে বাঙ্গালীরা তাদের জমি আবাদ করণ আর চাষাবাদ ও শিখিয়েছে। লেখা পড়ার ক্ষেত্রেও, বাঙ্গালীদের নিকট তাদের হাতে খড়ি। সাংবাদিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ইত্যাদিতেও, বাঙ্গালীরা তাদের পথিকৃত। বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের পথ প্রদর্শক ও ওস্তাদ। আজ সে পথ প্রদর্শক ওস্তাদ ও সেবকদের প্রতি হিংসা ও জাতিগত বিদ্বেষ প্রদর্শন, গর্হিত উদ্দেশ্য প্রনোদিত কাজই বটে। বাঙ্গালী সাহচর্য্য আজ আর তাদের অভিপ্রেত নয়। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাই আজ লক্ষ্য বলে বিদ্বিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবী না উঠালেও, এক দেশ ও একজাতি সত্তাকে অকার্যকর

করার প্রচেষ্টা চলছে।

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের তথ্য চর্চা ও বামরাজনীতি করার লক্ষ্য কি উপজাতীয় উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কাছে আত্মসমর্পন? দেশ ও জাতির কল্যাণে তাদের তথ্য চর্চা ও রাজনীতি করা। উপজাতীয় কল্যাণ তা থেকে বাদ নয়। দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করে, জুম্মল্যান্ড ও জুম্মজাতি প্রতিষ্ঠা, দেশ প্রেম নয়।

অখন্ডতাবাদী দেশ প্রেমিক হলে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করাই উচিত। বাম বা ডান রাজনীতি তাতে বাধা ইত্যাদি নয়। বাঙ্গালী বনাম উপজাতি এই ভিন্নতাকে পরিহার করে, অভিন্ন জাতিত্বে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। লক্ষ্য হতে হবে সবার সমানাধিকার ও কল্যাণ। এ দেশের বাসিন্দা ৯৯% লোক বাঙ্গালী। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯০% এলাকা জাতীয় ভূমি। পার্বত্য চুক্তির দফা নং- খ/২৬ অনুযায়ী এই জাতীয় অঞ্চল বিরোধীয় নয়। জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবী নামার ২/৫-ক ও ২/৫-খ অনুযায়ী মাত্র ৪৪৬ বর্গমাইলের ভিতরই তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সীমাবদ্ধ। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়া, ঐ পাঁচ দফা দাবী নামা ও পার্বত্য চুক্তিতে মান্য নয়। উপজাতীয় পন্ডিতরা কেন এই ফাঁকটি দিয়ে কথা বলেন না? তারা নিজেরা ও বাঙ্গালী মুসলমান লোকোদ্ভূত, এ সত্য তথ্যটি গোপন করেন। সুতরাং সত্য তথ্য চর্চা আমাদের কর্তব্য।

চাকমা ইতিহাসের কিছু মৌলিক উপাদান আছে, যে গুলোকে অবলম্বন করে, একটি যুক্তিগ্রাহ্য ইতিহাস রচনা করা যায়। কিন্তু চাকমা পন্ডিতরা তৎপ্রতি মনোযোগী নন। বরং তাদর কিছু লোক এমন একটি আজগৌবী ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট, যা উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত, যথাঃ

"সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশসরকার কার্পাসচুক্তি ভঙ্গ করে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্তকরে নেয়, এবং স্বাধীন রাজার শাসন খর্ব করে দিয়ে, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।"

সূত্র ঃ পার্বত্য জনসংহতি সমিতির অস্ত্র বিরতি ঘোষণা পৃষ্ঠা-১, তাং- ১.৮.১৯৯২ খ্রীঃ

"চাকমারা একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, যার উত্তরে ছিলো ফেনী নদী, দক্ষিনে শঙ্খ নদী, পূর্বে কুকি রাজ্য এবং পশ্চিমে - নিজামপুর সড়ক।"

সূত্র ঃ বাবু সুগত চাকমা রচিত চাকমা জাতি।

এই আজগৌবী তথ্যগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। ১৮৬০ সালের আগে চাকমারা কোন স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না, এবং কার্পাস চুক্তি বলে ও কিছু প্রদর্শন যোগ্য নয়। আরাকান থেকে আগত চাকমা প্রধান শের মস্ত খাঁকে চট্টগ্রামের নায়েবে নাজিম জুল কদর

খাঁ ১৭৩৭ সালে, সরকারী তুলা মহালের অধীন কোদালা অঞ্চলে, তরফে শুকদেব নামে একটি পাহাড়ী অঞ্চল বন্দোবস্তি দিয়েছিলেন, এবং স্থানীয় উপজাতীয় জুমিয়াদের নিকট থেকে তূলা ও নগদে জুমকর আদায়ের তহসিলদারী মঞ্জুর করেছিলেন। ঐ বলে সেখানকার শুক বিলাসে গড়ে তুলা হয়েছিল একটি কাছারী ও রাজভিলায় বাড়ি। মনে করা হয়, রাজস্থলী পর্যন্ত দখলাধিকার সম্প্রসারিত হয়। পরে ১৭৫৭ সালে মোগল বিরোধী বৃটিশ শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে, এবং বৃটিশ বিরোধীতাও মাথাচাড়া দেয়। ঐ গোলযোগের সুযোগ তখনকার চাকমা প্রধান শের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে ১৭৭৪ সালে চাকমা, কুকি, ও বাঙ্গালীদের যৌথ শক্তিতে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ ঘটে। সেই শের দৌলত খাঁর পুত্র জান বখশ খাঁর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে ১৭৮৭ সালে ঐ বিদ্রোহের অবসান হয়। ঐ তখনই রাজভিলা থেকে চাকমা সদর দপ্তর উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে অপসারিত হয়। শের মস্ত খাঁ থেকে অদ্যাবধি সব চাকমা প্রধানই সরকারের দ্বারা নিযুক্ত জুম খাজনার তহসিলদার। তাদের স্বাধীন রাজা হওয়ার দাবী ভ্রান্ত। সুতরাং স্বাধীন চাকমা রাজ্যের অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণ আজগৌবী।

এখন পুনরায় কিছু চাকমা নেতা স্বাধীন স্বরাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন; যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ১৭৭৪ বিদ্রোহে সম্ভব হয়নি, ১৯৪৭ এর বিদ্রোহে ভেস্তে গেছে, এবং পূনরায় শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সালের বিদ্রোহেও ব্যর্থ হয়েছে। ঐ স্বপ্নের স্বাধীন চাকমা রাজ্য কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, সে আশাটিও বৃথা। এখন পরিস্থিতি এমন যে, সশস্ত্র বাহিনী বাদে কেবল সাধারণ বাঙ্গালীরাই এতদাঞ্চলের অখন্ডতা রক্ষায় যথেষ্ট। শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হলে উপজাতীয় বিদ্রোহীরা দেখতে পাবে তাদের মাথার উপর অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র বাঙ্গালী খাড়া, যাদের অধিকাংশ অত্যন্ত দক্ষ অস্ত্র বাজ। মুক্তিযুদ্ধ, শান্তি শৃঙ্খলা, ও দেশ রক্ষায় যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত। এই শক্তিকে তুচ্চ জ্ঞান করা হবে বোকামী। বরং উপজাতীয়দের উচিত হবে একজাতি ও এক দেশের চেতনায়, নমনীয় আপোষের নীতি গ্রহণ। সমানাধিকার ও গণতন্ত্রই পালনীয়। অগ্রাধিকার, পদ সংরক্ষণ, ও বাড়াবাড়ি মোটেও শান্তির উপায় নয়।

অতীতে মুসলিম অভিজাতরা চাকমাদের রাজা রূপে মান্য হয়েছেন। বাংলাদেশেরস্বাধীন মুসলিম আধিপত্য একটি অবিসম্বাদিত স্থায়ী রাজনৈতিক পরিণতি। এই বাস্তবতাকে উপজাতীয়দের পক্ষে উপড়ে ফেলা অসম্ভব।

বাংলাদেশে উপজাতিদের স্থায়ী অধিবাসীর মর্যাদা পেতে কোন আপত্তি নেই। নব প্রজন্মের মত দেশাভ্যন্তরে লোক জনের আসা যাওয়া, স্থানান্তর, বসতি স্থাপন, রোজগার, কর্মসংস্থান ইত্যাদি তৎপরতা চলবেই। আলো, বাতাস, পানি ও মাটিতে সবার অধিকার মান্য। এ ব্যাপারে বাধা নিষেধ অভিপ্রেত নয়।

২. পাবর্ত্য সমস্যার সমাধানে করণীয়

(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক পৃষ্ঠা-৫, মতামত তাং-১৪ জানুয়ারী ২০০৩)

শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে এখনো রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রশাসনিকভাবেও প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল উপেক্ষিত। সময়ই যেন একদা সমাধান এনে দিবে, তারই অপেক্ষায় কাল ক্ষেপণ চলছে। কিন্তু সমস্যাক্রান্ত লোকেরা তাতে প্রবোধ মানছে না। তাদের পক্ষে কিছু করা দরকার। কিন্তু সে করাটা করবে কে? রাজনীতিকরা ব্যর্থ। প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরাও সাহস হারা। তাদের কাছে ক্ষমতা পদ ও চাকুরী স্বার্থটাই বড়।

পার্বত্য সমস্যাটি বহুমাত্রিক ও বহু দিনের সৃষ্ট। এটি আস্তে আস্তেই স্তুপিকৃত হয়েছে। এর দায় অতীত থেকে এখন পর্যন্ত বহুজনের উপর বর্তায়। এখন তুবড়ি মেরে মুহূর্তে এ থেকে রেহাই পাওয়াও দুষ্কর।

আশার কথাঃ ৮ম জাতীয় সংসদে পার্বত্য অঞ্চল সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব এম,কে,আনোয়ার, সংসদকে আশ্বস্ত করেছেন যে, পার্বত্য চুক্তির অসাংবিধানিক ধারা সমূহ বাস্তবায়িত হবেনা। অথচ সংবিধান লঙ্ঘনের ব্যাপার সমূহ বিষদ আলোচনায় আসছেনা, উহ্যই থেকে যাচ্ছে। বিষয়টি, সিনিয়র আইনজীবী ও খোদ সুপ্রীম কোর্টকেও সংক্ষুব্ধ করছে না। এ বিষয়টি কেবল আইন লঙ্ঘনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশ ও জাতির বিভক্তির সম্ভাবনাতেও সম্পৃক্ত। বাঙ্গালীরাও তাতে বিভ্রান্ত। মন্ত্রী জনাব মান্নান ভূঁইয়া বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তিনি ইউএনডিপি ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিতে বলেছেন; চুক্তির প্রতিটি ধারা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং হবে। তাই চুড়ান্ত বিপদের আশংকা অবশ্যই করা যায়।

পৃথক জাতিত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম ভিত্তিও তাই। বসনিয়া পূর্ব তিমুর ইত্যাদি স্বতন্ত্র জাতি রাষ্ট্র সমূহ, এই ভিত্তিতেই সৃষ্ট। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, এই একই পথে ধাবিত। ব্যতিক্রম হলোঃ এখনো এখানে বিচ্ছিন্নতার দাবী ওঠেনি। এই অবসরটুকু হলো আমাদের পক্ষে সতর্ক হওয়ার সময়। দেশের অখন্ডতা, সংবিধান ও পার্বত্য চুক্তিকে অবলম্বন করে আমাদের আঁট ঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

পার্বত্য চুক্তিটাই আমাদের পক্ষে হস্তক্ষেপের সুযোগ এনে দিয়েছে। চুক্তিতে দুই

বিপরীত ধারা বিদ্যমান। একটি হলো সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা মান্যতার ও অপরটি তা লঙ্ঘনের।

চুক্তিপত্রের মুখবন্ধ হলো একটি উদার অঙ্গীকার, যথাঃঃ"বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, নিুবর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনিত হইলেন।"

এই বক্তব্যের অন্তর্ভূক্ত সিদ্ধান্তমূলক নীতি ও অঙ্গিকার হলোঃ

(ক) চুক্তিটি বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় রচিত হবে, তথা তদ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত হবে না।

(খ) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য বহাল রাখা হবে।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিক, তথা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে বসবাসরত সবাই, কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ ছাড়াই, এমনকি বাংলাদেশের অন্য সব নাগরিকরাও এই পার্বত্য অঞ্চলে নিম্নোক্ত অধিকার ও সুবিধাবলী ভোগ করবেন, যথাঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার ও উন্নয়ন।

চুক্তির এই অনুকূল ধারা, পরবর্তী দফাওয়ারী বর্ণনায়, বিপরীত ব্যবস্থাদির দ্বারা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। চারখন্ডে বিভক্ত এই চুক্তি রোয়েদাদ, মুখবন্ধের অঙ্গিকার অনুসারে সংবিধান সম্মতভাবে রচিত হয়নি। তাতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬, ৪২, ১২২ ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এগুলো আইনী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত লঙ্ঘনের বিষয়গুলো, আন্তসাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক শান্তি, স্বার্থ, সংহতি, সমতা, সুবিচার ও গণতন্ত্রকেও বিঘ্নিত করে, এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিবর্তে, উপজাতীয়তাকে উস্কানী দেয়, যা সংবিধানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়।

চুক্তিতে নিহিত সংবিধান বিরোধী ধারা সমূহ, যথা ঃ-

১। **খন্ড (ক)-১ ঃ** এই দফায় ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইনে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেবল উপজাতি অধ্যূষিত অঞ্চলরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এবং আদমশুমারী মতে, বাঙ্গালীরা স্থানীয় প্রধান সম্প্রদায়। জনসংখ্যায়ও তারা প্রায় অর্ধেক। এখানে একমাত্র উপজাতীয়দের স্বীকৃতি দেয়াতে, এতদাঞ্চল একক উপজাতীয় আবাসভূমি রূপে স্বীকৃত হয়েছে তাদের অগ্রাধিকার, বিশেষাধিকার, স্বায়ত্ত শাসন এমন কি আত্ম-

নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের রাজনৈতিক পথ ও খোলাসা হয়ে গেছে। এই সাথে বাঙ্গালীরা হয়ে পড়েছে অবহেলিত জিম্মি। এ হলো দেশ ও জাতির বিভক্তির রাজনৈতিক সূত্র। এতে একক এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও জাতি-সত্তার সংবিধান প্রদত্ত ধারণা ক্ষুন্ন হয়েছে, যা অনুচ্ছেদ নং- ১ ও ৬ (২) দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। আঞ্চলিকতা ও উপজাতীয়তা এই আইনে নিষিদ্ধ।

২। খন্ড (খ) ঃ এই দফা হলো, পার্বত্য রাঙ্গামাটি / খাগড়াছড়ি / বান্দরবন জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। বর্ণিত এই তিন জেলা পরিষদের জন্য এমন স্বতন্ত্র আইন রচিত ও জারি হয়েছে, যা বাংলাদেশের অপরাপর জেলা পরিষদের পক্ষে অভিন্ন নয়। এটা আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও আইনী বৈষম্য সম্পন্ন। সংবিধানের ধারা নং- ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬, ও ৪২ এই বৈষম্যাদি অনুমোদন করে না। ল

খন্ড (খ) ১। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং- ২ (ক) ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং-২ (খ) তে পার্বত্য অবাঙ্গালীদের উপজাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বাঙ্গালীদের বলা হয়েছে অউপজাতি। এ মূল্যায়ন ও নামকরণ অযৌক্তিক। বাঙ্গালীরা বহু কোটি সংখ্যক একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। জনসংখ্যার হিসাবে স্থানীয়ভাবে ও তারা একক প্রধান সম্প্রদায়। তাই এই প্রধান সম্প্রদায়টির পক্ষে নিজ নামে আখ্যায়িত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। তাদের বিপরীতে উপজাতীয় সংখ্যালঘু লোকদের অবাঙ্গালী নামে আখ্যায়িত হওয়াটাই যথার্থ। এখানে উপজাতীয়তার প্রাধান্য দেয়ায়, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক গুরুত্বেরই অবতারণা হয়েছে, যা সংবিধানের ১ ও ৬ (২) অনুচ্ছেদে ব্যক্ত ধারণার পরিপন্থী।

৩। খন্ড (খ) ৪ / (ক) ও (খ) ঃ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং- ৪/১ (ক, খ, গ ও ঘ) চেয়ারম্যান পদসহ উপজাতিদের পরিষদের ২/৩ এবং বাঙ্গালীদের ১/৩ সদস্য পদ দান করেছে। এ বিধি ব্যবস্থা সংবিধানের ধারা নং- ৯, ১১, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ এর প্রকাশ্য লঙ্ঘন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার বিশেষাধিকার ও পদ সংরক্ষণ মান্য নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা নং- ১, ৯, ১১, ৪৮, ৫৫, ৬৫, ১২২ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অনুকরণে বর্ণিত পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদদের আইন ও নির্বাচন বিধি রচিত হয়নি। মনোনয়ন ভিত্তিক অবাধ যুক্ত নির্বাচনই সংবিধান ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুমোদন করে।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। সে অবধি প্রেসিডেন্সিয়েল সরকার ও শাসন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত। অথচ অনেক বিভাগীয় সংস্থা ও স্থানীয় শাসন ভিত্তিক পরিষদ আর প্রতিষ্ঠান এখনো প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান শাসিত। পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ সমূহ এই পদ্ধতিতে পরিচালিত, যা দ্বাদশ সংশোধনীর পরিপন্থী। উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী গণতন্ত্রের সাথেও সামঞ্জস্যহীন।

৪। খন্ড (খ) ৪-গ ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা নং- ৪ (৫) ও ৪ (৬ পাহাড়ী বাঙ্গালীদের সবাইকে স্থানীয় বাসিন্দা ও নাগরিক সনদ

লাভ প্রশ্নে উপজাতীয় সার্কেল চীফদের অধীন এবং এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের কর্তৃত্ব বিলোপ করা হয়েছে। অথচ মৌলিক আইন অনুযায়ী স্থানীয় জেলা প্রশাসকরাই এ জাতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী। জমিদারী ও সর্দারী সামন্তবাদ, ১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (আইন নং- ২৮/১৯৫১) এবং বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১ ও ৭ কর্তৃক বাতিল হয়ে গেছে। তদুপরি উপজাতীয় সর্দারদের কর্তৃত্ব বাঙ্গালীদের উপর প্রযোজ্যই নয়। যথা ঃ পার্বত্য শাসন আইন নং- ৩৫।

৫। **খন্ড (খ) ৯ ঃ** এ দফা ও জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রূপে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার শর্ত আরোপিত হয়েছে, এবং স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সনদ পেতে কেবল বাঙ্গালীদের জন্য শর্ত হলো জায়গা জমির মালিকানা, ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানার অধিকারী হওয়া। অথচ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১২২ এরূপ কোন শর্ত আরোপ করে না। এখানে বিবেচ্য যে, বাংলাদেশী গণপ্রজাদের অর্ধেকই প্রায় ভূমিহীন। অথচ অনুচ্ছেদ নং- ১, ৭ ও ১১ তাদের এই প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিকদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পার্বত্য উপজাতীয়দের স্থানীয় আদীী ও স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ার কারনে ভোটাধিকার দান করে নি। তাই তারা ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ভোটার ছিলো না।

৬। **খন্ড (খ) ১৩ ও ১৪, খন্ড (গ) ৭, খন্ড (গ) ১০, ও খন্ড (ঘ) ১৮ ঃ** এই দফা সমূহ ও সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা নং- ৩১, ৩২ (২) এবং ২৮ ও ২৯-এ, নিযুক্তি ও চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই বৈষম্য ও ভেদাভেদ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুমোদন করে না।

৭। **খন্ড (খ) ২৬ (ক ও খ) ঃ** এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং- ৬৪ পরিষদীয় এলাকা ও পরিষদমুক্ত এলাকা সুনির্দিষ্ট করেছে। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য অঞ্চলকেই পরিষদভূক্ত রাখা হয়েছে। এটা চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট আইনকে অমান্য করা, যা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। জরিপের মাধ্যমে পরিষদীয় এলাকা ও পরিষদমুক্ত এলাকা সুনির্দিষ্ট হয়নি। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য অঞ্চলকেই পরিষদভূক্ত রাখা হয়েছে ও সুনির্দিষ্ট আছে। আমার হিসাবে তিন পার্বত্য জেলা মিলে পরিষদীয় এলাকা মাত্র ৪৪০ বর্গমাইল, এবং জনসংহতি সমিতির হিসাব মতে তা ৪৪৬ বর্গমাইল মাত্র। অথচ সরকার তিন জেলা পরিষদের হাতে গোটা পার্বত্যঞ্চল তথা ৫০৯৩ বর্গমাইলই ছেড়ে দিয়েছেন, এবং তাতে জেলা পরিষদের ভূমি নিয়ন্ত্রণ মূলক পূর্বানুমোদন মেনে নিয়েছেন। এতে জমি বন্দোবস্তি, হস্তান্তর, নামজারি, ও অধিগ্রহণ বন্ধ আছে। অথচ ভূমি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সার্বভৌম ক্ষমতাধীন বিষয়। এটি প্রত্যাহারযোগ্য নয়। দুঃখ জনক হল, যে জায়গা জমি ও অঞ্চল নিশ্চিত রূপে পরিষদীয় এখতিয়ারভূক্ত নয়, তা থেকে সরকারী হাত গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং বর্ণিত দফা ও আইনে এ বলা নিরর্থক যে, "তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা, ও সরকারের নামে

রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে, এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।" (সূত্রঃ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং- ৬৪ ও পার্বত্য শাসন আইন নং- ৩৫)।

৮। **খন্ড (খ) ১৬ (গ) ঃ** এই দফা ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গিকারে বলা হয়েছে যে, কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার সাবেক মালিকদের বন্দোবস্তি দেয়া হবে। বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। শুকনো মৌসুমে বর্তমানে ১৫/২০ হাজার একরের বেশি জমি ভাসে না, এবং তাতে নিকটবর্তী লোকজনেরাই ফল ফসল ফলায়। কিন্তু একদা ভবিষ্যতে হ্রদ এলাকা ভরে যাবে, এবং তার অধিকাংশই ভেসে উঠবে। তখন পূনঃ আবাদ ও বন্দোবস্তির সুযোগ দেখা দিবে। তবে হ্রদ অঞ্চলভূক্ত ১, ৬৩, ৮৬৩ একরের মধ্যে কেবল ৫৪ হাজার একর জমি মাত্র ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিলো, এবং অবশিষ্ট ১, ০৯, ৮৬৩ একর জমি ছিলো সরকারী খাস ও বনভূমি। নিকটবর্তী ভোগ দখলকারী লোক ও অন্যান্য ভূমিহীনদের বঞ্চিত করে, পূর্বের ক্ষতিপূরণের দ্বারা স্থানান্তরিত ও পূনর্বাসিতদের ঐ সব জমিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্দোবস্তি দান হবে অযৌক্তিক। পরিবেশগত কারণে ও সাবেক মালিক ও তাদের বংশধরদের অধিকাংশ হ্রদ অঞ্চল ও তার আশে পাশে নেই, এবং প্রাপ্তব্য জমিও হবে, তাদের ছেড়ে যাওয়া জমির চেয়ে দ্বিগুন। তাদের পক্ষে এই ঢালাও অধিকার প্রাপ্য নয়।

৯। **খন্ড (খ) ৩০ ও ৩১ ঃ** এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং- ১২ ও ৭০ চেয়ারম্যানকে সাসপেন্ড করণ ও অন্য কারো কাছে ক্ষমতা অর্পন থেকে সরকারকে বারণ করা হয়েছে, যা কার্যতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা ত্যাগ।

১০। **খন্ড (খ) ৩৩ ও ৩৪ ঃ** এই দফা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা তফসিলে, আইন শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষন ও তাঁর উন্নতি সাধন পরিষদের ক্ষমতাভূক্ত করা হয়েছে। অথচ জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় শাসন ভিত্তিক অধঃস্তন প্রতিষ্ঠান, এবং এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে একমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনই মান্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১ ও ৫৯ সমূদয় মৌলিক ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় সরকার ভিত্তিক করে রেখেছে। স্থানীয় শাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানাদি কেবল কেন্দ্রীয় মোসাহেবী ক্ষমতারই মালিক, তার বেশি নয়।

জেলা পরিষদ আইন ৬৪তে ভূমি প্রশাসন ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রদত্ত হয়েছে অথচ ভূমি প্রশাসন মৌলিক কেন্দ্রীয় বিষয়; ভূমি প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিষয় নয়। স্থানীয় ক্ষমতা তফসিলে এ সবের অন্তর্ভূক্তি, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পক্ষে ক্ষতিকর। এসব অনুমোদনীয় নয়। এ জাতীয় ক্ষমতা ক্ষুদে উপজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে, এবং তাতে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, সংবিধান মান্যতা, এবং একক স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গিকার হবে ক্ষুন্ন।

১১। **খন্ড (গ)** তে আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চুক্তিভূক্ত খন্ড (খ)

২৬ ও জেলা পরিষদ আইন ৬৪ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিষদভূক্ত করেনি। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই পরিষদীয় এলাকারূপে হস্তান্তরিত হয়ে আছে। এ খেলাপী কাজের হোতা জন সংহতি সমিতি নয়, সরকার নিজে, এবং এর দ্বারা গোটা পার্বত্য অঞ্চলই বিরোধীয় অঞ্চলে পরিণত হয়ে গেছে। বসতিভূক্ত অঞ্চল ৪৪০ বা ৪৪৬ বর্গমাইল থেকে বেড়ে, গোটা ৫০৯৩ বর্গমাইলে পরিণত হয়েছে। পরিষদীয় শাসন সম্প্রসারণের এই বাড়াবাড়ি, আসলে চুক্তিজাত কিছু নয়। চুক্তির বলে জন সংহতি সমিতি, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিষদীয় এলাকা বলে দাবী করতে পারে না। বরং এই বলে কিছু বাড়তি অঞ্চল দাবী করতে পারে যে, আবাদী সম্প্রসারণ ও বন্দোবস্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল সঙ্কুচিত হয়ে, বাস্তবে বসতি অঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটেছে, এবং তা কার্য্যতঃ বনাঞ্চল থেকে অবমুক্ত হয়ে বসতি অঞ্চলের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এ দাবী মেনে নিলেও, বসতি অঞ্চল তথা পরিষদীয় অঞ্চলের আয়তন, গোটা পার্বত্য অঞ্চলের অর্ধেকের বেশী হয় না। এরূপ বাড়াবাড়ি পার্বত্য সমস্যা সৃষ্টির উদাহরণ। বৃটিশ আমল থেকে এভাবে প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে সমস্যাদির সৃষ্টি করা হয়েছে।

পার্বত্য সমস্যার মূল অনুধাবনে এখানে তার অতীত আলোচিত হওয়া দরকার। আসলে চট্টগ্রামেরই অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম। উপজাতীয়রা চট্টগ্রামী জন সমষ্টির অংশ নয়। তারা নিজেরা চট্টগ্রামী মূলের লোক বলেও দাবী করেনা।

১৮৬০ সালে পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল রূপে এতদাঞ্চলকে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়েছে। এতদাঞ্চল ছিলো বন ও পাহাড়ের সমষ্টি, এক বসতি বিরল ভূ-ভাগ। বৃটিশ আমলের শুরুতে, আরাকানে বর্মী আক্রমণ, এবং পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ কার্যক্রম, ত্রিপুরা, লুসাই ও আরাকানী জাতি গোষ্ঠীয় লোকদের ব্যাপক সংখ্যায় বাস্তুচ্যুত করে, এবং তারা সংঘাতপূর্ণ নিজ নিজ বসতি এলাকা ত্যাগ করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরুপদ্রব ও দুর্গম পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ঐ উদ্বাস্তু শরণার্থীদেরই বংশধর হল বর্তমান পার্বত্য উপজাতীয়রা। যারা চট্টগ্রামে ছিলো নেহাত সংখ্যালঘু, এবং স্থানীয় না হলেও, আরাকান, লুসাই ও ত্রিপুরা দখলের ফলে বৃটিশ প্রজা। এই প্রজা অধিকারের পাশাপাশি, চট্টগ্রাম অঞ্চল, পাহাড়ে ও সমতলে, উত্তরে, দক্ষিণে বিভক্ত আর দুই প্রশাসনভূক্ত হওয়ার ফলে, আকস্মিক ভাবে, পূর্বাঞ্চলে উপজাতীয় গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এবং সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত ভাবে, তারা এর রাজনৈতিক সুফলভোগী হয়ে দাঁড়ায়।

কার্যতঃ বার্মা বিতাড়িত চাকমা, মগ ইত্যাদি আরাকানীরা ছিল বৃটিশ অনুগৃহীত, তাই তাদের অনুগত। আর ত্রিপুরা, লুসাই ও কুকীরা ছিলো বৃটিশ আক্রান্ত, তাই তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত। এই পরিবেশ পরিস্থিতি, বৃটিশ অনুগতদের স্বার্থানুকূল হয়। তখন অনুগত শরণার্থীদের তিন দলপতিকে বৃটিশ সরকার সর্দারী, আর্থিক সুবিধা, ও সামন্তীয়

মর্যাদা দান করেন। তাদের নেতৃস্থানীয়দের মৌজা প্রধান রূপে নিযুক্ত করা হয়। চট্টগ্রামী তথা বাঙ্গালী প্রাধান্য আর আধিপত্যের বিলুপ্তি এভাবেই সাধিত হয়। এই উপজাতীয় আধিপত্য ও প্রাধান্যকে শেষমেষ রেগুলেশন নং- ১/১৯০০ এর দ্বারা আইনী ও স্থায়ী রূপ দেয়া হয়। বৃটিশ শাসনের অবসানে সামন্ত প্রথার বাহন দেশীয় রাজ্য আর জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র, পশ্চিম-উত্তর-সীমান্তের কাবায়েলী স্বায়ত্ত শাসনের অনুকরণে, পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তের পার্বত্য চট্টগ্রামেও সর্দারী সামন্ত প্রথা বহাল রেখে দেয়। এটাই পরিণামে শক্তিশালী উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের সংগ্রাম ও বিদ্রোহে পরিণত হয়। যদি ১৯৫১ সালে জমিদারী উচ্ছেদের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্দারী সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধিত হয়ে যেতো, এবং সারা দেশের মত স্থানীয় ভূমি প্রশাসন, রাজস্ব বিভাগাধীন তহসিলের নিকট হস্তান্তরিত হতো, তা হলে স্থানীয়ভাবে ভূমি প্রশাসন নির্ভর, আঞ্চলিকতাবাদী উপজাতীয় রাজনীতিক শ্রেণীর জন্ম হতো না। বাংলাদেশ আমলেও তহসিল প্রথা প্রবর্তন না করা হয়েছে গুরুতর ভূল। ফলে উপজাতীয়দের ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব ভোগজাত আধিপত্যের উৎপাত জোরদার হতে পেরেছে।

২। **খন্ড (গ)- ১ এ বলা হয়েছে ঃ** তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে, এবং বাস্তবেও তাই হয়েছে। অথচ সংবিধানে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের রূপরেখা ভিন্ন, যথাঃ

"অনুচ্ছেদ নং- ৫৯ (১) ঃ আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"

বর্ণিত এই সাংবিধানিক রূপরেখায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি, যথা ঃ-

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট বা একাংশ নয়।

(খ) এখনো দেশ ভিত্তিক কোন একক আইনী স্থানীয় শাসন কাঠামো প্রণীত হয়নি।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধান সম্মত শাসন প্রতিষ্ঠান নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১ অনুসারে গোটা বাংলাদেশ একক রাজনৈতিক ইউনিট। এর কোন আঞ্চলিক ভাগ বিভাগ নেই। এ হেতু রাজনৈতিকভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ইউনিট নয়। এই শূণ্য অস্তিত্ব নিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত।

১৩। **খন্ড (গ) ২** ও সংশ্লিষ্ট আইনে, আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানকে পরোক্ষ ভাবে, কেবল উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। এবং খন্ড (গ) ১২ ও সংশ্লিষ্ট আইনে, অনির্বাচিত অন্তরবর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানে, পরোক্ষ নির্বাচন, ও অন্তরবর্তী ক্ষমতা দান বা গ্রহণের কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বিধান নেই। এই বাড়াবাড়ি সংবিধান সম্মত নয়।

১৪। **খন্ড (ঘ) ৪, ৫ ও ৬ (খ)** বলে, একটি ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে, যার চেয়ারম্যান

হবেন একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। তাতে সদস্য হবেনঃ-

১) চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার বা অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

২) সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় সার্কেল চীফ।

৩) আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি।

৪) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়রম্যান বা প্রতিনিধি।

এই ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হলো ঃ-

ক) জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা।

খ) অবৈধভাবে যে সব জায়গা জমি ও পাহাড়, বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে, সে সব জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করা।

এই কমিশনের রায় হবে চুড়ান্ত। এর বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজাতীয়দের ভূমি সংক্রান্ত অভিযুক্ত পক্ষ হলো বাঙ্গালীরা। বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে জাতিগত ও রাজনৈতিকভাবে তাদের আপত্তি হলো ঃ বিগত জিয়া সরকার, স্থানীয় উপজাতীয় মৌজা প্রধান ও সার্কেল প্রধানদের অনুমোদন ছাড়া, স্বউদ্যোগে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছেন। মৌজা ও সার্কেল ব্যবস্থা, হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল আইনে প্রতিষ্ঠিত। মৌজা হেডম্যান ও সার্কেল চীফদের অনুমোদনে ভূমি প্রশাসন প্রচলিত। জিয়া সরকার এই প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রথা, রীতি ও পদ্ধতি লজ্ঘন করে, বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছেন। তাতেই বাঙ্গালীদের প্রদত্ত জমি ও পাহাড়ের বন্দোবস্তি ও দখল স্বত্ব অবৈধ বলা হয়েছে।

এই অভিযোগের বিচার কাজ এমন এক বিচারপতির হাতে ন্যস্ত হয়েছে, যিনি অভিযুক্ত সরকারের দ্বারাই নিযুক্ত। তার সহযোগীও সরকারী কর্মচারী। অবশিষ্ট তিন সদস্য হলেন অভিযোগকারী পক্ষভূক্ত নেতৃস্থানীয় লোক। সুতরাং এই কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নয়। এই বিচার ব্যবস্থাকে আপীল বহির্ভূত রাখা আরেক অবিচার। তদুপরি সরকারের বসতি স্থাপন ও বন্দোবস্তি দান ইত্যাদি সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা তো একমাত্র সুপ্রীম কোর্টেরই প্রাপ্য। ভূমি কমিশন সুপ্রীম কোর্টের এই এখতিয়ারের উপর হস্তক্ষেপের অধিকার রাখেনা।

১৫। খন্ড (ঘ) ১৯ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায়, উপজাতীয়দের মধ্য থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা সংবিধানের ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদ বিরোধী।

এই অভিযোগগুলো, আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত খুঁটি নাটি বিচারে গুরুতর তো বটেই, এতে দেশের সর্বোচ্চ পালনীয় আইন সংবিধান, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, আর সার্বভৌম ক্ষমতা ও হুমকির সম্মুখীন। দেশ জাতি ও সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেনা। এখানে আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নটি জড়িত। আনুষ্ঠানিকভাবে আইনজীবীদের কেউ এই বিষয়টি নিয়ে বিচার প্রার্থী হলে, বা যে কোন সংক্ষুব্ধ নাগরিকের আবেদনে, বা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে আকৃষ্ট

হয়ে, স্ব উদ্যোগে বিষয়টি মামলা রূপে সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের জানামতে সুপ্রীম কোর্টে অনুরূপ বহু মামলা গৃহীত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বহু মামলাও সুপ্রীম কোর্টে উত্থাপিত আছে, যা আইনজীবীদের উদ্যোগের অভাব, অথবা মোসাবেদা সংক্রান্ত ক্রটির কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে। আইনজীবীদের অধিকাংশ দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত। দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ও নির্দেশে তারা বিষয়টি বিবেচনা করেন। ফলে দলীয় বিরোধীতা ও রাজনীতি তাদেরকে এ ব্যাপারে দমিয়ে রেখেছে। বাদ বাকি আইনজীবীরা, বিষয়টিকে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসিক মনে করেন। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলাগুলো পরিচালিত হচ্ছে না। এই নেতিবাচক ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টকেই দুঃসাহসিক উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। এ অনানুষ্ঠানিক মামলার বিষয় হলোঃ পার্বত্য চুক্তি তার মুখবন্ধের অঙ্গিকার অনুসারে রচিত হয়নি, এবং তাতে দফায় দফায় বাংলাদেশ সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে, যা সংশোধন হওয়া ব্যতীত কার্যকর হওয়া আইন সঙ্গত নয়। বিবাদী চুক্তিকারী পক্ষ হলেন- (ক) বাংলাদেশ সরকার ও (খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। অবিলম্বে এই সাংবিধানিক ক্রটি সংশোধনে মাননীয় আদালতের আদেশই কাম্য।
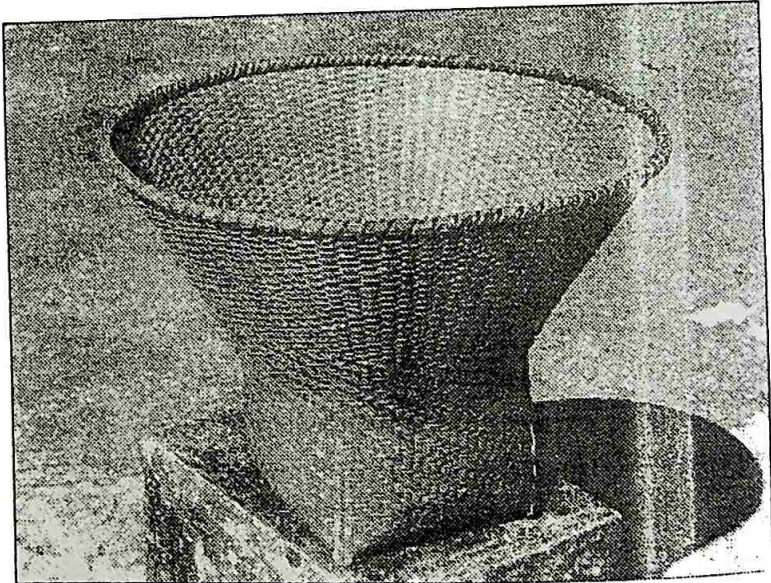
একটি উপজাতীয় ঝুড়ি

৩. চুক্তি অনুসারেই পার্বত্য সমস্যার সমাধান সম্ভব

শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও শান্তির দেখা নেই। সংশ্লিষ্ট দুইপক্ষ কেবল দোষারোপ ও বাগাড়ম্বর নিয়ে ব্যস্ত। মাঝখানে আমরা ভুক্তভোগীরা হতাশাগ্রস্ত। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগেঃ চুক্তি কি ভুলের সমষ্টি, যা বাস্তবায়ন করা ক্ষতিকর বা অসুবিধাজনক, অথবা এটি একটি ফাঁকি, যা বিদ্রোহীদের গৃহবন্দি আর বিদ্রোহকে বানচাল করার এক রাজনৈতিক কুট কৌশল মাত্র? যা-ই হোক, তাতে ও তো স্বস্তি নেই।

বাস্তবতা হলো ঃ অশান্তি, উগ্রতা, হানাহানি, বিদ্বেষ ইত্যাদি অনাচার সমূহ অব্যাহত আছে। আগে যা পরিচালিত হতো সীমান্তের ওপার আর এপারের গোপন আস্তানাগুলো থেকে। এখন তা আস্তানা পেতেছে সংশ্লিষ্টদের গৃহকোণে। সন্ত্রাস আর বিদ্রোহকে গৃহকোণ থেকে ও নির্বাসিত করা না গেলে, শান্তি স্থাপিত হবেনা। তাই নতুন করে কৌশল নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। পরকে প্রবঞ্চনা দান নিজেদের আত্মপ্রবঞ্চনায় পরিণত হয়েছে। এ পথ পরিত্যজ্য। পাবর্ত্য চুক্তি সত্যিকার শান্তিচুক্তিতে পরিণত হতে পারে, তার উপাদান তাতে আছে। সেই কাঙ্খিত উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কেবল নেতিবাচক চিন্তা, আর প্রতিপক্ষকে জব্দ করার কুট কৌশল অবলম্বনে দীর্ঘদিন কেটেছে। তবু সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জন্য কিছু পরামর্শ রাখবো, যা চেয়ে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করছেন। বয়সের কারণে শারীরিক অক্ষমতা আমাকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। তাই ইদানিং লেখালেখি কমিয়ে দিয়েছি। আর্থিক অভাব অনটনও আমাকে কাবু করে রেখেছে। জীবিকা নির্বাহ আর স্বাস্থ্য রক্ষা এখন আমার বড় দায়। তবু কম্বলকে ছাড়লেও ঐ কম্বল আমাকে ছাড়েনা। বিভিন্ন পক্ষ নাছোড় বান্দার মত পার্বত্য বিষয়ে আমার পরামর্শ ও তথ্য জানতে চান। তাতে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চুপ থাকতে পারিনা। কিছুদিন ধরে কর্তৃপক্ষীয় মহল থেকে এ বলে আমাকে চাপ দেয়া হচ্ছেঃ পার্বত্য অঞ্চলে আদৌ কি শান্তি স্থাপন সম্ভব এবং তার সূত্র কি? এ ব্যাপারে আমার চিন্তা চেতনা যেন সুসমন্বিত ও বিষদ আকারে প্রকাশ করি। সরকারী নীতি নির্ধারণে এ আলোচনাটি প্রয়োজনীয়। এ চাপ দানের সূত্র আমারই এই মন্তব্য যে, চুক্তি অনুসারেই পাবর্ত্য সমস্যার সমাধান সম্ভব, এবং তজ্জন্য দরকার আরেকটি উভয় পাক্ষিক বৈঠক, যেখানে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে চুড়ান্ত সমঝোতায় পৌছার চেষ্টা করা যাবে।

বৈঠকের আগে অমীমাংসিত সমস্যাবলী ও তার সমাধানের ব্যাপারে উভয়পাক্ষিক সদস্যদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরী হবে। নতুবা তাদের দ্বারা নতুন করে ভুল সিদ্ধান্ত

গৃহীত হতে পারে, যা বাঞ্ছিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে দেখা দরকার অমীমাংসিত সমস্যাবলী ও সে সমূহের মীমাংসার রূপরেখা কী? এখানে চুক্তি বহির্ভূত বিষয়াবলী টানার প্রয়োজন নেই। চুক্তি অনুযায়ী সে সব পরিত্যজ্য।

আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ্য হলো চুক্তির মূলনীতি ঃ বাংলাদেশ সংবিধান অনুকরণ। সংবিধান লঙ্ঘনের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। দেশ ও জাতি বিভাজ্য নয়। এ প্রশ্নটি মীমাংসিত। বাঙ্গালী-জুম্মজাতি বিভক্তি এবং ভেদাভেদ বিবেচনাযোগ্য নয়। সংবিধানই একজাতি এক দেশ এবং সমানাধিকারের মীমাংসা করে দিয়েছে। এখন বঞ্চনা, ভেদাভেদ অবিচার ও বৈষম্যের কোন আইনী অবকাশ নেই। এই নীতি আদর্শ সবার জন্য ন্যায় বিচার, সমানাধিকার, উন্নয়ন ও অগ্রগতির গ্যারান্টি। পৃথক আইন, অগ্রাধিকার ও কোটা ব্যবস্থা, সংবিধানিক গ্যারান্টির সমকক্ষ নয়। সংবিধান অলঙ্ঘনীয়, বিপরীতে অন্য সব আইন ও অধিকার ভঙ্গুর। সুতরাং এ ধারণা যথার্থ নয় যে, পৃথক আইন ও অধিকার সব পাওয়ার সূত্র। চুক্তিভূক্ত মুখবন্ধটি সঠিকভাবেই রচিত এবং তা উভয় পক্ষ কর্তৃক সঠিকভাবেই অনুমোদিত হয়েছে। চুক্তির এ মূলনীতি সংবিধান সম্মত এবং অবশ্যই অনুকরণীয়। এ বক্তব্যের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। চুক্তিভুক্ত যে কিছু ইতিবাচক বক্তব্য আছে, আলোচ্য মুখ বন্ধটি তার অন্যতম যথা ঃ

"বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন"।

এই চুক্তির সুবিধাভোগী লোকজন হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিকসহ বাংলাদেশের সকল মানুষ, কেবল পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় লোকেরা নয়। এই মূলনীতি অনুযায়ী সংবিধান সার্বভৌমত্ব আর অখন্ডতার আওতায় চুক্তিভূক্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত সমূহ বিচার্য্য। এই মূলনীতির ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে চুক্তিভূক্ত খন্ডগুলোতে কোনরূপ ভিন্নতা থাকতে পারে না। তবে বাস্তবতা হলো, চুক্তিভুক্ত প্রতিটি খন্ডেই সংবিধান সার্বভৌমত্ব সার্বজনীনতা আর অখন্ডতা বিরোধী কিছু কিছু সিদ্ধান্ত অন্ত র্ভুক্ত হয়েছে, যা মূলনীতি ও ঐকমত্যের পক্ষে নেতিবাচক। এগুলো সংশোধন বা বাতিলযোগ্য। এই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত আর তার পক্ষে রচিত আইন সমূহ কার্যকর করার প্রশ্নই ওঠেনা। সংবিধান খোদ ঘোষণা করেছেঃ সংবিধান বিরোধী কোন আইন রচিত হলে, তার যতটুকু সংবিধানের সাথে অসমঞ্জস, ততখানি বাতিল হবে, (সূত্রঃ অনুচ্ছেদ নং- ৭ (২) ও ২৬ (১) এবং অনুরূপ সংবিধান বিরোধী আইন রচনাকে ও নিষেধ করা হয়েছে,

যথা অনুচ্ছেদ নং- ২৬ (২)।

এই পর্যায়ে চুক্তিভূক্ত খন্ড সমুহে কোন কোন ধারা উপধারা, সংবিধান, সার্বভৌমত্ব অখন্ডতা ও সার্বজনীনতা বিরোধী তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এই আপত্তিজনক চুক্তিধারা এবং তার পক্ষে রচিত আইন সমূহ অবশ্যই বাতিল হবে। তার পক্ষে চুক্তি মুখবন্ধই উভয়পাক্ষিক ঐকমত্য।

দ্বিতীয় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হলো চুক্তিভুক্ত খন্ড খ/২৬ নং দফা এবং তার পক্ষে রচিত পাবর্ত্য জেলা পরিষদ আইন নং- ৬৪ যথা ঃ "ক) আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্ত যোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত ক্রয় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"

বর্ণিত চুক্তি ধারা ও আইনের দ্বিতীয় প্যারার এই ছাড় অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের ৪৭৫২.৯৬ বর্গমাইল এলাকাই ভূক্তির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের তাতে কোন অধিকার নেই, যথা ঃ

১। রক্ষিত বন বা Reserved Forest :	
ক) উত্তর বন বিভাগ-	৬১৭ বর্গমাইল
খ) দক্ষিণ বন বিভাগ-	৩১৫ "
গ) শঙ্খ বন-	১২৮.২৫ "
ঘ) মাতামুহুরী বন-	১৬০.৭১ "
২। ক) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা +	
খ) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা +	
গ) রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা = (আনুমানিক)	১০ "
৩। সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমি ঃ	
ক) ইউ এস এফ বা অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বন	= ৩১৬৬.৪০ বর্গমাইল।
খ) অধিগ্রহণকৃত কর্ণফুলী হ্রদ	= ২৫৬.০০ "
গ) প্রশাসনিক দপ্তর ও স্থাপনা সমূহ (আনুমানিক)	= ১০০.০০ "
সর্বমোট ঃ-	**৪৭৫২.৯৬ বর্গমাইল।**

এই হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন জেলা পরিষদ মিলে মোট নিয়ন্ত্রনযোগ্য ভূমি হলো (৫০৯৩ - ৪৭৫২.৯৬) = ৩৪০.০৪ বর্গমাইল মাত্র। এটা হলো চুক্তির এখতিয়ারভূক্ত ভূমি পরিধি। এর বাহিরে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন এখতিয়ার নেই। অথচ তারা বর্তমানে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫০৯৩ বর্গমাইল ব্যাপ্ত এখতিয়ার

ভোগ করছেন, যা চুক্তি বিরোধী এবং আইন বিরোধী ও বটে । এই চুক্তি বিরোধীতা ও বেআইনী ক্ষমতা ভোগকে জায়েজ করার কোন উপায় নেই । সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয়ই এই সীমা লঙ্ঘনের জন্য সমান দোষে দোষী । জাতির কাছে এ জন্য তাদের জবাব দেহী করতে হবে ।

জনসংহতি সমিতির দ্বারা উত্থাপিত পাঁচ দফা দাবীতে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরোধীয় অঞ্চল রূপে চিহ্নিত নয় । দাবী নামার ২/৫ (ক) ও ২/৫ (খ)ই তার প্রমাণ । সরকারকে জন সংহতি সমিতি পাঁচ দফা দাবী নামার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তাতেও তারা সরকারকে অভিযুক্ত করে ৪৪৬ বর্গমাইল এলাকাই মাত্র পরিষদভুক্ত আছে বলে স্বপক্ষে একটি হিসাবও দিয়েছে । সরকার ও জনসংহতি সমিতি ঐ হিসাব মেনে নিয়েই চুক্তি সম্পাদন করেছেন । এখন আর তা থেকে পিছাবার কোন পথ নেই । চুক্তি মানতে হলে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ কে ৪৪৬ বা ৩৪০.০৪ বর্গমাইলে সঙ্কুচিত হয়ে যেতে হবে । তাদের সাম্রাজ্যের পরিধি এটাই ।

যতই হাক ডাক দেয়া হোক বাস্তবে চুক্তি ও আইন অনুসারে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ৪৭৫২.৯৬ বর্গমাইল অঞ্চল পরিষদ সমুহের এখতিয়ারাধীন নেই । এই মোট অঞ্চলের এখতিয়ার জেলা প্রশাসকদের হাতে ন্যস্ত । এই সব অঞ্চলের সম্পদ সম্পত্তি বাঙ্গালী অবস্থান এবং সেনা ক্যাম্প পরিষদীয় এখতিয়ার থেকে মুক্ত ।

চুক্তিভূক্ত এই হিসাবের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একক ও সামগ্রিকভাবে উপজাতীয় বা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল । বাস্তবে বাঙ্গালীরা স্বদেশ ভূমির এই অঞ্চলে বহিরাগত বা অস্থায়ী অস্থানীয় নয় । তারা স্থানীয় অবাঙ্গালীদের সমান অধিকার ভোগের অধিকারী । সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৬ ও ৪২ ধারাই হলো তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের রক্ষা কবচ । এর ব্যতিক্রম আইনত: মান্য নয় । সাথে সাথে উপজাতীয়রাও সমান অধিকার ভোগী নাগরিক রূপে মান্য । তাদের প্রতি বৈষম্য আরোপ অন্যায় । তাদেরকে সমান অধিকার ভোগের গ্যারান্টি দেয়া জরুরী । উভয় পাক্ষিক সার্বজনীনতা লঙ্ঘন যোগ্য নয় । পার্বত্য চুক্তিতেও এই নীতি সমর্থিত । উভয় পাক্ষিক বৈঠকের লক্ষ্য হওয়া চাই এই সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটান, এবং চুক্তির মূল স্পিরিটের প্রতি গুরুত্ব দান । তা হলেই আপোষের ভিত্তিতে সব সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব । নির্বাচন, স্থানীয় শাসন, শিক্ষা, দারিদ্র মোচন ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড সমঝোতার ভিত্তিতে অনায়াসেই পরিচালিত হতে পারে । সাম্প্রদায়িকতা আইন সঙ্গত হতে পারে না । সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যই নিয়ন্ত্রনযোগ্য ।

পার্বত্য চুক্তির অন্যতম রচয়িতা ও স্বাক্ষর দাতাপক্ষ জনসংহতি সমিতি জেনে শুনেই এটি সম্পাদন করেছে । এটিতে ভুল হলে তারা তার সংশোধনে বাধ্য । কিন্তু এ পর্যন্ত চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছেনা, এই অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া কোন গঠনমূলক প্রস্তাবই তাদের কাছ থেকে আসছে না । তারা এ কথা বুঝতে নারাজ যে, সংবিধান বিরোধীতা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি চুক্তির দায়িত্ব এড়াতেও সরকার অক্ষম । মধ্যপন্থা হলো এ ব্যাপারগুলোতে নিস্ক্রিয়

ও নীরব থাকা। সরকার তা-ই করছেন। সরকার ও জাতিকে পার্বত্য ব্যাপারগুলোতে সক্রিয় করার দায়িত্ব হলো মূলতঃ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের। তাদেরকে বিদ্বেষহীন অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ রচনারও দায়িত্ব নিতে হবে। জাতীয় সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি রচনাই জাতি ও দেশের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের উপায়। তারা কি একথা ভেবে দেখেছেনঃ উপজাতীয় পাড়া পরিবেশ বাঙ্গালীদের পক্ষে নিরাপদ নয়। এর বিপরীতে বাঙ্গালী এলাকাগুলো উপজাতীয়দের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। নিরাপত্তার অভাব বোধ থেকেই আমিসহ অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রতিবেশী উপজাতীয় বন্ধুদের খোঁজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। বন্ধু চারু বিকাশ চাকমাকে দেখতে গিয়ে সেদিন নজরে পড়লো, এক বাঙ্গালী ছেলেকে উপজাতীয় ছেলেরা পিটাচ্ছে। দোষ ত্রুটির কথা জানিনা। তবে আমি আর এগুতে পারলাম না। এটি শান্তির সহায়ক পরিবেশ নয়।

এই সাথে বিবেচ্য অনুকূল সাংবিধানিক আইন ঃ

অনুচ্ছেদ নং- ৭। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপুর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৬। (১) এই (মৌলিক অধিকার) ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে

কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃ প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে, তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) ১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (১৯৭৭ সালের ১নং ফরমানসমূহ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

৪. বিরোধ মীমাংসায় উপজাতীয়দের সাথে আরেকটি সংলাপ প্রয়োজন

পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে উপজাতীয়দের দাবী দাওয়া অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছে। এখন তা আগের মত বিশাল ও কঠিন নেই। অবশিষ্ট দাবী দাওয়া নিয়ে এখন যে আন্দোলন চলছে তা অযৌক্তিক ও একগুয়ে নয়। এ গুলোর ভিত্তি পার্বত্য চুক্তি।

অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম, ত্যাগ ও ক্ষয় ক্ষতির ফসল পার্বত্য চুক্তি। এর ভিতর কিছু দোষ ক্রটি থাকা সম্ভব। এই স্বল্প দোষ ক্রটির জন্য এটি প্রত্যাখ্যাত বা বাতিল হওয়ার যোগ্য নয়। দোষ ক্রটি উদ্ঘাটিত হলে, তা যৌক্তিক ভাবেই সংশোধিত হতে পারে, সে পথ বন্ধ ভাবা যায় না। চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় এরূপ একগুয়ে কঠোর ও কঠিন বলে ভাবার কোন অবকাশ নেই। ভাবা যায়ঃ সরকার পক্ষেরই অযোগ্যতা, অজ্ঞতা ও অদুরদর্শীতার ফল সমালোচিত দোষ ক্রটি। কারণ উপজাতীয় পক্ষ এই ক্ষেত্রে দাতা নয়, গ্রহীতা। তাদের দাবী দাওয়া থেকে সরকার যা মঞ্জুর করেছেন, তাই তাদের প্রাপ্য হয়েছে, এবং এটারই অপ্রাপ্ত অংশের এখন তারা দাবীদার, তার বেশী নয়।

চুক্তি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দ্বারা দোষ ক্রটি উদ্ঘাটিত হলে, তার সংশোধন অসম্ভব নয়, চুক্তিতেই সে মুল নীতি নিহিত আছে। মুল সমঝোতা মূলক বক্তব্যের সমষ্টি হলো চুক্তি মুখবন্ধ। এটাকে উভয় পাক্ষিক অঙ্গীকারও বলা যায়। এটাই চুক্তির দোষ ক্রটি উদ্ঘাটন ও শুদ্ধ অশুদ্ধ হওয়ার মাপকাঠি। সরকার কোন দোষ ক্রটির ভিত্তিতে, বা জাতীয় ক্ষোভ অসন্তোষ ফুঁসে ওঠার ভয়ে, চুক্তিভূক্ত কিছু বিষয়ের বাস্তবায়ন স্থগিত করে থাকলে, সে বিষয়ে নিশ্চুপ না থেকে, তা প্রতিপক্ষ জন সংহতি সমিতিকে অবহিত করে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হতে পারতেন। এটা উভয় পাক্ষিক দায়িত্ব হলেও, জন সংহতি সমিতিকে তজ্জন্য অবহিত ও সক্রিয় করা হয়নি। এটা সরকারী ভুল, জন সংহতি সমিতির নয়। নিজের দোষকে চেপে রেখে এটা বলা সঠিক নয় যে, জন সংহতি সমিতি বাড়াবাড়ি করছে। জন সংহতি সমিতি যা করছে, তা তাদের সাংগঠনিক রাজনীতি। এটা দোষনীয় নয়। তাদের দোষনীয় বিষয় হলো পুনরায় সন্ত্রাসকে সক্রিয় ও সংগঠিত করা, যার ভিত্তিঃ চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না করা জাত হতাশা। এজন্য দায়ী সরকারের অকৌশলী কার্য্যক্রম।

বিরোধীয় বিষয় সমুহের ব্যাপারে আগে পরে কোন সরকারই জন সংহতি সমিতিকে অবহিত করেনি। তারা স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী আচরণে সন্দিহান ও হতাশ। এই হতাশা ও সন্দেহেরই ভিত্তিতে তাদের বর্তমান চার দফা দাবী উত্থিত, যথাঃ

১. চুক্তিভুক্ত বিষয়াবলীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।
২. সেনা ও অন্যান্য বাহিনী স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্প সমুহ প্রত্যাহার।
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে একজন উপজাতীয় পুর্নমন্ত্রী নিয়োগ।
৪. ওয়াদুদ ভূঁইয়া এম পি'র পরিবর্তে একজন উপজাতীয়কে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দান।

এই দাবীগুলো অযৌক্তিক বা বাড়াবাড়ি কিছু নয়। পূর্ববর্তী তিন সরকারই বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা করেছেন, যা পাবর্ত্য চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আাছে। এগুলোর বাস্ত বায়নের দাবীতে আন্দোলন হলে, তা দোষনীয় হতে পারে না। দোষ হলো সরকার পক্ষীয়দের যারা উপজাতীয়দের কাছে শঠতার দোষে অভিযুক্ত।

"ভাবিতে উচিত ছিলো প্রতিজ্ঞা যখন"- এই আপ্তবাক্যটি সরকার পক্ষীয়দের উপর প্রযোজ্য। চুক্তিকালে তাদের হুশ ছিলোনা। এখন বাস্তবায়নকালে চুক্তির দোষ ক্রটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এবং তারই ভিত্তিতে কোন কোন বিষয়ের বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছেন। উদ্ঘাটিত দোষ ক্রটি গুলো প্রতিপক্ষ জন সংহতি সমিতিকে অবহিত করাও হচ্ছে না। সংশোধনীরও কোন প্রস্তাব নেই। কিসের ভিত্তিতে জন সংহতি সমিতি নিশ্চুপ থাকবে বা সরকারের সাথে সহযোগিতা করবে? কেবল অন্ধ ভাবে যত দোষ নন্দ ঘোষ পার্বত্য জন সংহতি সমিতির। এ দোষারোপ ভূল। জন সংহতি সমিতি প্রায় প্রতিটি যুক্তিযুক্ত আপত্তিরই ইতিবাচক সমাধান দিয়েছে। তাদের প্রথম দাবী ছিলো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন। এরশাদ আমলে সংলাপের শুরুতে যখন তাদের বলা হলোঃ সাংবিধানিক ভাবে দেশ এককেন্দ্রিক, ফেডারেল নয়। এই ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন ছাড়া ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। সংবিধান সংশোধন কাজটিও অত্যন্ত জটিল। সংশোধনী প্রস্তাবটি আগে জাতীয় পরিষদে দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতায় মঞ্জুর হতে হবে। তৎপর জাতীয় গণভোটে তা গৃহীত হতে হবে। বিদ্রোহের কারণে জাতি পার্বত্য উপজাতীয়দের আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দিহান। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে, আঞ্চলিক রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, তখন দেশের অখন্ডতা রক্ষা করা হবে কঠিন। এই যৌক্তিক আলোচনার ভিত্তিতে জন সংহতি সমিতি নিজ দাবীনামার প্রস্তাব নং- ১ সংশোধনে রাজি হয়, এবং পরবর্তীতে তদস্থলে সংবিধান সংশোধন ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী প্রতিস্থাপিত হয়। দেশের অখন্ডতার পক্ষে অসুবিধাজনক ভেবে চুক্তি সম্পাদন কালেও জনসংহতি সমিতি আরো নমনীয় হয়, এবং দাবী নং- ১ থেকে সংবিধান সংশোধন ও স্বায়ত্ত শাসন অংশটিও নীরবে পরিত্যাগ করে। এই নমনীয়তার ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে, জন সংহতি সমিতির বাংলাদেশের অখন্ডতা স্বীকার মূলক ঘোষণা। সুতরাং এটা ভাবা অনুচিত যে, জনসংহতি সমিতি প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, এবং তার চরিত্র অনড় আর একগুয়ে। যুক্তিকে সে কখনো প্রত্যাখ্যান করেনি। নতুবা চুক্তি সম্পাদিতই হতোনা। তাই জনসংহতি সমিতির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষন করা সঠিক নয়। তার প্রতি আপোষহীনতার দোষারোপ সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

এখন অবশিষ্ট দাবী দাওয়ার ব্যাপারটির সুরাহা করাই সমস্যা। যদি সরকারের ধারণা

হয়ে থাকে, এ গুলোর বাস্তবায়নের দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত হবে, অথবা এগুলো জাতীয় স্বার্থ বিরোধী, যদ্বারা জাতীয় ক্ষোভ অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সম্ভব। এরূপ যে কোন পরিস্থিতির ব্যাপারে উচিত জন সংহতি সমিতির সাথে সরকারের বুঝাপড়ায় বসা। সংবিধান ও জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে চুক্তি মুখবন্ধে শক্তিশালী নীতি নির্ধারনী বক্তব্য আছে। তাই হতে পারে সংকট উত্তরনের চাবিকাঠি। এই মূলনীতি মূলক সমঝোতাও জনসংহতি সমিতি থেকে পিছ পা হলে, গোটা চুক্তিটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে, এমনটি হতে জনসংহতি সমিতি দিবে না। তাদের কোন বক্তব্যে এমন কোন মনোভাব কখনো ব্যক্ত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, সাংবিধানিক ও জাতীয় স্বার্থ ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি, তাদের সায় আছে। তাতে চুক্তির আভ্যন্তরিন কোন দফা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা তারা মেনে নিবে। এই ঐকমত্যই চুক্তিতে বিধৃত। চুক্তির সুবিধা জনক অংশ মানবে, আর অসুবিধাজনক অংশ প্রত্যাখ্যান করবে, এমন ঔদ্ধত্য জন সংহতি সমিতি কখনো প্রদর্শন করেনি। বাংলাদেশ সংবিধানর আওতায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ও বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়নই পার্বত্য চুক্তির লক্ষ্য। এটা একটি উদার ও বিজ্ঞ ঐক্যমত। জন সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ এর অন্যান্য রচয়িতারা তজ্জন্য উচ্ছসিত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এই সমঝোতা ও ঐকমত্যই চুক্তির মূল কথা। এর অনুসরণে সাংবিধানিক ও জাতীয় স্বার্থ ভিত্তিক ব্যবস্থা গৃহিত হতে কোন বাধা নেই। চুক্তি অনুযায়ী জন সংহতি সমিতি তাই চায়। সরকার বরং এর বিরূপ চিন্তায় আক্রান্ত। খামোখা জন সংহতি সমিতিকে বৈরী ভাবা হচ্ছে। আরেকটি মীমাংসা বৈঠকে, উভয় পক্ষ সংলাপে বসলে, দেখা যাবে, জন সংহতি সমিতি কোন কিছুর জন্যই দায়ী নয়, সব দোষ সরকারের। অনুমান ভিত্তিক এই দোষারোপ করা ঠিক নয় যে, জন সংহতি সমিতির লক্ষ্য কেবল উপজাতীয় কল্যাণ। এজন্যই মন্ত্রীপদ, চেয়ারম্যান পদ, দুই তৃতীয়াংশ সদস্য পদ, উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। উচ্চ শিক্ষা, কর্ম সংস্থান ও ভূমি সংস্থানে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। বাঙ্গালীদের প্রাপ্য কেবল উচ্ছিষ্ট। আসলে এই পদ সংরক্ষণ ও অগ্রাধিককার ব্যবস্থা, সরকারের পক্ষ থেকে, উপজাতীয়দের জন্য সন্তুষ্টি বিধান মূলক উৎকোচ বা উপহার। উপজাতীয় পাঁচ দফা দাবী নামায় এ সবের কিছুই অন্তর্ভূক্ত নেই। সরকার স্বেচ্ছায় এসব দিয়েছেন। মুখবন্ধের সমঝোতা অনুযায়ী এসব কিছুই প্রাপ্য হয়না। প্রত্যাখ্যান করারও প্রশ্ন উঠে না। এখন মুল সমঝোতা পর্যালোচিত হলে, জন সংহতি সমিতি এই দোষারোপকে প্রত্যাখ্যান করবে, এমনটি ভাবা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন দরকার সরকার ও জন সংহতি সমিতির আরেকটি সংলাপ বৈঠকে বসা। এই লক্ষ্যে সন্তু বাবু মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে একাধিক বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। মনে হয় সরকার পক্ষ অপ্রস্তুত। পার্বত্য সংকট বিষয়ে সমাধান মুলক কোন ধারণা তাদের নেই। এজন্যই পশ্চাদ ধাবন।

সরকার ও প্রশাসন আদালত নয়। চুক্তি ও আইনগত প্রশ্নে ভিন্নতা করার এখতিয়ার তাদের নেই। তাদের দায়িত্ব হলো তা পালন করা। চুক্তি ও আইন সংশোধন করার ক্ষেত্র

উভয় পক্ষ ও জাতীয় সংসদ। কোন অপ্রিয় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে হলেও, সুপ্রীম কোর্ট থেকে তার অনুমতি লাভ আবশ্যক। সরকার প্রতিপক্ষের সম্মতি গ্রহণ ছাড়াই, পার্বত্য চুক্তির প্রশ্নে এক তরফা আচরণ করছেন। জানতে ও চাচ্ছেন না, সাংবিধানিক ও জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তাদের পরামর্শ কী। এটাও জন সংহতি সমিতির কাছে জিজ্ঞাস্য যে, চুক্তি মুখবন্ধ ও তার আভ্যন্তরিন ভিন্নতার মাঝে সামঞ্জস্য সাধন কি করে সম্ভব?

সরকার পার্বত্য বিরোধ প্রশ্নে ধামাচাপা দান, ও সময় ক্ষেপণে ব্যস্ত। এটা সঠিক কর্তব্য পালন নয়। তারা এটা বুঝতে অপারগ যে, বিষয়টি এখন মীমাংসার দ্বার প্রান্তে উপনীত। চুক্তি থেকে পিছানো নয়, মূলতঃ এর দ্বারাই সাফল্য অর্জন সম্ভব। চুক্তির দ্বারা জনসংহতি সমিতির হাত পা বাঁধা। সে ভিন্ন কিছু করতে নীতিগত অক্ষম। এখন তার দ্বারা অনুষ্ঠিত সন্ত্রাস হলো, চুক্তি বাস্তবায়ন না করার হতাশা জাত উপদ্রব। তাদের সন্দেহঃ চুক্তি আদৌ টিকে থাকে কিনা। হয়তো আবার তাদের সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার প্রয়োজন হতে পারে। তাই তাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি।

সরকার তাদের আশ্বস্ত করছেন না। চুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের এ কথা বুঝান সম্ভব যে, কতিপয় চুক্তি দফার দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে, যা চুক্তিতেই নিষিদ্ধ। আপত্তি ভূক্ত এই চুক্তি দফা সমূহ বাস্তবায়ন না করা চুক্তি লঙ্ঘন নয়। জন সংহতি সমিতি, চুক্তির এই দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন। যুক্তির প্রতি তারা অনুগত। আলোচনা ছাড়া তারা স্বতোস্ফুর্ত ভাবে বলতে পারে না যে, সরকারের এই স্থগিত করণ সিদ্ধান্ত যথার্থ।

উভয় পাক্ষিক কোন বৈঠকে, এখনো পার্বত্য চুক্তির দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন, ও তা নিরসন নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। এমনটি হলে, জন সংহতি সমিতির এ সংক্রান্ত মুল্যায়ন কি তা জানা যেতো। এবং তারই ভিত্তিতে সংকট উত্তরনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো। বুদ্ধি বৃত্তিক পর্যায়ে পার্বত্য চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে এ যাবৎ অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। জন সংহতি সমিতি সে সম্বন্ধে অবশ্যই ওয়াকিবহাল। কিন্তু এ যাবৎ এই সংগঠনটি চুক্তির দোষ ত্রুটির প্রশ্নে কখনো মুখ খুলেনি। চুক্তি তাদের এক বিরাট রাজনৈতিক অর্জন। এটিকে ঘায়েল করা তাদের লক্ষ্য হতে পারে না। তাই তারা এ ব্যাপারে নীরব। কিন্তু সরকারের দায়িত্ব হলো দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন ও তা নিরসনের ব্যবস্থা করা। সে দায়িত্ব পালিত হচ্ছে না। বিপরীতে জন সংহতি সমিতি, নিজেদের অর্জনকে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে আন্দোলনে নেমেছে। এটা করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এটা তাদের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা নয়, দৈনন্দিন রাজনীতির অংশ মাত্র। এই প্রেক্ষাপটে সরকার দোষী সেজে চুপ মেরে না থেকে, চুক্তির দোষ ত্রুটি প্রশ্নে সোচ্চার হতে পারেন। তাতে জন সংহতি সমিতি হয় নমনীয় হবে, নয়তো উত্তপ্ত মনোভাব ব্যক্ত করবে। শেষ পর্যন্ত তাতে যুক্তিরই জয় হবে, এবং জন সংহতি সমিতি চুক্তি সংশোধনে রাজি না হয়ে পারবে না। এ ছাড়া তারা দোষ ত্রুটি স্বীকার ও চুক্তি সংশোধনীতে সম্মত হতে পারে না।

বাংলাদেশ সংবিধানকে পার্বত্য চুক্তিতে সর্বোচ্চ মান্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাতে

নীতিগত ভাবে চুক্তির সংবিধান বিরোধী দফা গুলো অকার্যকরই বলা যায়। এই অকার্যকরতা সমাধানের মালিক সম্মিলিত ভাবে চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়, অথবা সুপ্রীম কোর্ট। চুক্তি দফা বাস্ত বায়ন অথবা স্থগিত করণে চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাবান। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে, ঐক্যমত সৃষ্টির প্রয়োজনে, উভয় পাক্ষিক সংলাপ আবশ্যক। জন সংহতি সমিতি অনুরূপ সংলাপে উদগ্রীব বলে বিরোধ মীমাংসায় তার আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছে। অথচ সরকার এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়, যা দুঃখ জনক। সংলাপ অনুষ্ঠিত হলে জন সংহতি সমিতি চুক্তির ব্যাপারে আরো ছাড় দিতে ও নমনীয় হতে সুযোগ পেতো, যা না হওয়া দুর্ভাগ্যজনক।

চুক্তির দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে উভয় পাক্ষিক সমঝোতা হয়েই আছে। নতুন করে উত্থিত চার বিরোধীর ব্যাপার অমীমাংসিত কিছু নয়। এই প্রশ্নে উভয় পাক্ষিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হলে, অবশ্যই সুরাহা পাওয়া যাবে। জন সংহতি সমিতি কৃত সমঝোতার ভিন্নতা করবে, তা ভাবা অমুলক। বদ্ধ মুল ধারণা আর সন্দেহই সরকারকে চিন্তায় ফেলে রেখেছে। সমিতি ও তজ্জন্য সরকারের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। নিয়মিত বৈঠক হলে, ভুল বোঝাবুঝি আর সন্দেহ তো দুর হতোই, যুক্তি মান্যতা ও তাতে বাড়তো। বিরোধ মীমাংসায় ও তা হতো সহায়ক। সংযোগ না রেখে, দুরে বসে থেকে, সন্তু লারমা ও উপজাতীয়দের সন্দেহ করা সরকার সহ অনেকের মাঝেই ক্রিয়াশীল।

এটা স্বাভাবিক যে, স্বজাতীয় কল্যাণ ও নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি সন্তু বাবুরা অগ্রাধিকার সহকারে ভাববেন। বিপরীতে দেশ ও জাতির পক্ষে সরকারকেও সোচ্চার হতে হবে। নতুবা গোল হবে এক তরফা। এটাই হয়েছে চুক্তি কালে ও পরে। সরকার পক্ষের লক্ষ্য ছিলো উপজাতীয় পক্ষের সন্তুষ্টি বিধান এবং চুক্তি সম্পাদন। তাদের ভয় ছিলো সংলাপের ব্যর্থতায় যদি স্বাধীনতা ঘোষিত হয়ে যায়, তখন উপজাতীয়দের বাগে আনা হবে আরো কঠিন। যদিও এই ধারণা ছিলো অমুলক। ভারত সহ বিশ্ব পরিস্থিতি ছিলো জন সংহতি সমিতির প্রতিকূলে। সমঝোতায় দেরী হলে, ভারত নিজেই তাদের ঠেলে দিতো সীমান্তের এ পারে। এই বিরূপ চাপের মুখেও সন্তু বাবু জন সংহতি সমিতিকে চমৎকার নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকারকেও প্রচন্ড চাপের মুখে রেখেছেন। ফলে চুক্তিটি তারই চিন্তা চেতনার অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে। তদ্দারা প্রমাণিত, তিনি একজন পরিপক্ক রাজনীতিবিদ। তিনি পার্বত্য উপজাতীয় সমাজে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

আসলে সন্তু লারমা লেখা পড়ায় তো বটেই, রাজনীতিতেও নেতৃত্ব সুলভ দক্ষতায় একজন উঁচু মাপের নেতা। তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন উপজাতীয় নেতা নেই। মুলতঃ একজন স্কুল শিক্ষকের পুত্র নিজেও পেশায় প্রথমে স্কুল শিক্ষক, তৎপর পার্বত্য উপজাতীয় সমাজে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ার সুবাদে গুরু রাজনীতিকে পরিণত। স্থানীয় উদীয়মান রাজনীতিকদের প্রায় সবাই তাঁর ও প্রয়াত বড় ভাই মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার শিষ্য। উচ্চাভিলাষী শিষ্যদের কেউ কেউ এখন তাকে ডিঙ্গাবার চেষ্টা করছেন, যেমন ইউ, পি, ডি, এফ নেতা প্রসিত খীসা, এবং মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার চ্যালেঞ্জকারী, ত্রিপুরায় অবস্থানরত

প্রিতি কুমার চাক্‌মা। কিন্তু লারমা ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজনৈতিক গুরুর আসন টলানো তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ছিলেন একজন রাজনৈতিক জিনিয়াস। ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমারও তিনি গুরু। এখন সে প্রধান গুরুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ছোট ভাই সন্তু লারমা। তিনিও আরেক জিনিয়াস। উপজাতীয়দের উপর তার রাজনৈতিক প্রভাব অপরিসীম। বিরল রাজনৈতিক প্রতিভাই তাকে নেতৃত্বের শীর্ষ স্থানে উন্নীত করেছে। তার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কাছে উপজাতীয়দের প্রায় সবাই শ্রদ্ধাবনত। আকাশচুম্বী ইমেজের বলে মনে হয়, তিনি উপজাতীয় রাজাদের ও রাজা। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এক প্রান্তিক নেতা হলেও, প্রতিভায় তিনি অন্যতম বাংলাদেশী জাতীয় নেতা হওয়ার যোগ্য। নেতৃত্বের বিরল প্রতিভায় তিনি অনেক জাতীয় নেতাকেও টেক্কা দিতে সক্ষম। তাকে ক্ষুদ্র পরিসরে, বিদ্রোহী উপজাতীয় নেতা রূপে ঠেসে রাখা অনুচিত। একমাত্র ব্যক্তি তিনি, যার দ্বারা সম্ভব, পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মাঝে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন রচনা করা এবং পার্বত্য অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাকে উপড়ে ফেলা।
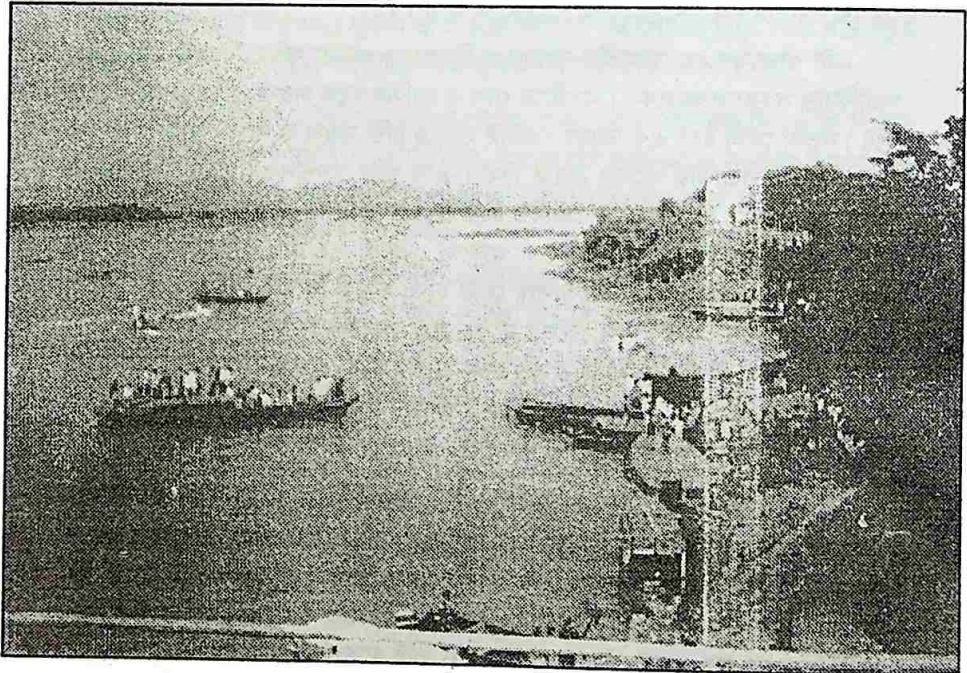
কর্ণফুলী হ্রদে নৌকা যাত্রী

৫. গুচ্ছ গ্রামবাসী বাঙ্গালীদের জিম্মিদশা

১৯৮৬ সালে এরশাদ আমলে স্থানীয় উপজাতি ও বাঙ্গালীদের পারস্পরিক হানাহানি প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। এতো ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সরকারী বাহিনীগুলোর পক্ষে সামাল দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থায় মারমুখী উপজাতি ও বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা ক্যাম্পসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আওতায় উঠিয়ে এনে, অস্থায়ীভাবে গড়ে তোলা গুচ্ছ গ্রামসমূহে পুনর্বাসিত করা হয়। তবে উপজাতিদের কোন গুচ্ছ গ্রামেই ধরে রাখা যায়নি। তারা ক্রমে ক্রমে সীমান্তের এপারে-ওপারে সরে পড়ে, শরণার্থীর জীবন শুরু করে। কিন্তু বাঙ্গালী গুচ্ছ গ্রামবাসীরা হয়ে পড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে জিম্মি। ১০-১৫ হাত জায়গার ভিতর একটি অস্থায়ী কুঁড়ে ঘর ও কিছু ফ্রি রেশনই হয়ে পড়ে তাদের জীবন ও জীবিকার অবলম্বন। সেই ১৯৮৬ সালে শুরু হওয়া অস্থায়ী গুচ্ছ গ্রামের বসবাস এখন পর্যন্ত তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। গত দীর্ঘ বছরে মূল আঠাশ হাজার গুচ্ছ গ্রামবাসী বাঙ্গালী পরিবার বেড়ে এখন অন্তত পঞ্চাশ হাজারাধিক পরিবারে পরিণত হয়েছে। সেই আগের দেড় লাখ গুচ্ছ গ্রামবাসী জনসংখ্যা এখন কমপক্ষে আড়াই লাখের কম নয়। পরিবার বেড়েছে, কিন্তু গৃহসংস্থানের জায়গা বাড়েনি। সেই আগের এক ঝুপড়িতেই বাপ-বেটার পৃথক সংসার আর গৃহপালিত পশু-পাখি একসঙ্গে গাদাগাদি করে বসবাস করছে। পেশাব-পায়খানা, গোবর-চোনা ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনাসহ মানুষের এক সাথে সহাবস্থান। রেশন কার্ড আগে যা ছিলো, এখনো তাই আছে। বাড়তি লোকজনের কোন খাদ্য সংস্থান নেই। কাজ নেই, কৃষি সংস্থান নেই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা অনুপস্থিত। বাড়তি প্রায় এক লাখ লোক মূল পরিবারের বোঝা হয়ে আছে। এদের নিজ মূল জায়গা জমিতে ফিরতেও দেয়া হচ্ছে না। অজুহাত- শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা। বলা হচ্ছে, জায়গাগুলো নিষ্কন্টক ও নির্বিরোধ নয়। উপজাতীয়রা তার দাবীদার। তজ্জন্য তাদের হামলে পড়া সম্ভব।

এদিকে অধিকাংশ ফ্রি রেশন কার্ড বেহাত হয়ে গেছে। মহাজনরূপী সচ্ছল সুযোগ সন্ধানীরা অভাবী, অসুবিধা গ্রস্ত, রোগ-শোকে অসহায় এই লোকদের রেশন কার্ডগুলো হাওলাত কর্জ আর বন্ধকের নামে হাতিয়ে নিয়েছে। তারাই এখন ফ্রি রেশন গ্রহীতা। রেশন নেই, জমি নেই, রুজি-রোজগারও নেই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা অনুপস্থিত, অসহায় ও দারিদ্র্যে জর্জরিত এই গুচ্ছ গ্রামবাসীরা এখন নিরুপায়। তাদের এই মানবেতর জিম্মিদশার কোন প্রতিকারও লক্ষণীয় নয়। তাদের কোন আশাভরসা আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও কল্পনীয়

নয়। এরূপ বাঁচা-মরার প্রশ্নে তাদের মাঝে কোন আন্দোলন আর আলোড়নও নেই। এই প্রশ্নে সরকার, দেশ ও জাতি সবাই নীরব। বিষয়টি দুঃখজনক। তবে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে এ লোকজনের ভোটগুলো পাওয়ার প্রয়োজন হবে। সেই প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা, সপক্ষের বা বিপক্ষের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতির মিঠাকথা নিয়ে হাজির হবেন এবং তাতে আবার এই বঞ্চিত ভোটাররা আরেক দফা মিথ্যা আশায় আশান্বিত হবার সুযোগ পাবেন। দল আর প্রার্থীরা তো সেই আগের তারাই, যারা জয়ী হয়েছেন, ক্ষমতা ভোগ করেছেন, কিন্তু এই অভাগা ভোটারদের ভাগ্যের পরিবর্তনে তারা কেউ উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি। একথা বলে ঐ ক্ষমতাশালীদের বিরাগভাজন হওয়ারও সাহস এই হতভাগ্যদের নেই। এরা ভোটার হিসেবেও জিম্মি। উদাহরণ রূপে বলা যায় -দীঘিনালা উপজেলার গুচ্ছগ্রাম কবাখালী জামতলী, রসিক নগর, বোয়ালখালী, পাবলাখালী, সোহানপুর ইত্যাদি এলাকার ৯৪৫টি গুচ্ছগ্রামবাসী পরিবারের মধ্যে ৫১২টি পরিবারেরই কোন রেশন কার্ড ও গৃহসংস্থান নেই। বাকি ৪৩২টি পরিবারের ২২২টি কার্ডই হাতছাড়া। তারা তাদের মূল রেশন কার্ড ও গৃহ সংস্থানধারী বাপ-দাদাদের উপর বোঝা। এই পাড়াগুলোর অনেক রেশন কার্ড স্থানীয় মহাজন, মাতবর, দোকানদার, ফড়িয়া ইত্যাদি সুযোগ সন্ধানী লোভী লোকদের হাতে বন্ধক অথবা ঋণের দায়ে আটক আছে। এখন ঐ ফ্রি রেশন ওরাই খায়। ফ্রি রেশনের মূল্যে কবে ঐ ঋণ বা বন্ধকীয় দায় শোধ হয়ে গেছে, তবু ঐ রেশন কার্ডগুলো মুক্তহয়নি। ঋণ আর বন্ধকও বহাল আছে। মাতবর ও মহাজন চরিত্রের লোকেরা রেশন কার্ড হাতিয়ে নিয়ে বহুদিন যাবৎ ফ্রি রেশন ভোগ করছে। বর্ণিত ৭৩ জন কার্ড শিকারীদের ৩১ জনই হিন্দু, ২২ জন বড়ুয়া, আর ২০ জন মুসলমান। ব্যবসা, চাকুরি কৃষি ইত্যাদি পেশায় তাদের সবাই জড়িত। তাদের অনেকের পাকা বাড়ীঘর, দোকান ও কৃষি খামার আছে। পরিবারের কোন কোন সদস্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায়ও নিয়োজিত। আদি পুরাতন বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে উপজাতীয়দের সাথেও তাদের সম্পর্ক ভালো। তবে ভুক্তভোগী সেটেলারদের বক্তব্যে প্রকাশ- শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ রেশন কার্ডই অসেটেলার মহাজন শ্রেণীর লোকেরা হাতিয়ে নিয়ে আটকে রেখেছে। প্রতি মাসে তারাই ঐ ফ্রি রেশন তুলেও ভোগ করে। এই অপ্রিয় বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। তবে কতৃপক্ষ এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন না। তাদের এই নীরবতা রহস্যজনক। ইচ্ছা করলে রেশন উঠাবার সময় ঐ বেআইনী রেশন কার্ডধারীদের পাকড়াও করা যায় এবং ঐ কার্ডগুলো জব্দ করে তা মূল মালিকদের ফিরিয়ে দেয়াও সম্ভব। কিন্তু কে এই ঝামেলা করে? সেটেলাররা অসংগঠিত, অসচেতন। দিন রাত ভাত কাপড়ের চাহিদা মিটাতে প্রাণান্তকর ভাবে ব্যস্ত। সরকারী কর্তৃপক্ষেরও গায়ে পড়ে ঝামেলা বাড়াবার তাগিদ ও ফুরসৎ নেই। সুতরাং বিনা বাধায় এই ফ্রি রেশনের লুটপাট চলছে। গুচ্ছ গ্রামবাসী সেটেলাররাও ধুঁকে ধুঁকে কালাতিপাত করছে। এই রেশন লোপাট ও পুনর্বাসন সংকট একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। এর সুরাহা হবে কিনা কেউ জানে না।

এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় খাগড়াছড়ির জেলাপ্রশাসক বর্নীত রেশন কার্ড গুলো জব্দ করে নিয়েছেন। তাতেও ভূক্ত ভোগিরা উদ্বিগ্ন।

বিষয়টি সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার, মৌলিক চাহিদা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু কে এই অভিযোগের পক্ষে সক্রিয় হয়? এ ব্যাপারে কারো যেন কোন দায় নেই। প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ, মানবাধিকার সংস্থা এবং আইনজীবী/পেশাজীবীদের সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপিত হোক সে অপেক্ষায় আছেন। আর ভুক্তভোগী নেংটি বাঙ্গালীরাও আশা করছে; কর্তৃপক্ষীয়ভাবে একটা কিছু সুরাহা নিশ্চয় হবে। এই অপেক্ষার পালা কখন শেষ হবে, তা কেউ বলতে পারে না।

পাহাড়ীরাও বিভ্রান্ত। নেতৃপর্যায় থেকে তাদের বুঝান হচ্ছে, এই গোটা পর্বতাঞ্চল আদিকাল থেকেই তাদের দখলভুক্ত ভূমি। এখানে বাঙ্গালী আবাসন গড়াই হলো উপজাতীয় দখলাধিকার হরণ। এটি অব্যাহত থাকলে তদ্বারা ধীরে ধীরে পাহাড়ীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। তারা বাঙ্গালী সংখ্যাধিক্যের মাঝে হারিয়ে যাবে। তখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই হবে দায়। তাই উপজাতীয় আধিপত্য রক্ষার আন্দোলন, তাদের বাঁচামরারই আন্দোলন। এর কোন বিকল্প নেই। বাঙ্গালী গ্রহণ মানে উপজাতিদের আত্মহত্যা। বাঙ্গালী আবাসন প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরদার ও ভয়ংকর করার উপায় হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ। তাছাড়া ক্ষুদ্র নিরীহ এই পাহাড়ী জাতির দাবীর প্রতি সমর্থন আদায় সম্ভব নয়।

পাহাড়ী সমাজে এই প্রচারণা এ পর্যন্ত সফল হয়েছে। এর প্রথম সুফল হলো- পুরাতন বিধি ব্যবস্থাসহ উপজাতীয় শাসন বহাল আছে। দ্বিতীয় সুফল হলো, উপজাতি শাসিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছ এবং রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী পরিষদেও ভাগ লাভ নিশ্চিত হয়েছে। এবং শেষ সুফল হলো বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ স্রোত থেমে গেছে।

বিপরীতে রাষ্ট্র ও বাঙ্গালী পক্ষের যুক্তি প্রদর্শন ও জনমত গঠনের প্রবণতা একেবারে অনুপস্থিত। এ পক্ষের যুক্তি হতে পারে, বাংলাদেশ পাহাড়ী বাঙ্গালী সবার জাতীয় স্বদেশভূমি। এখানে আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত আধিপত্য স্বীকার করা মানে বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেয়া। একদেশ ও একজাতি হয়ে থাকার উপায় হলো সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সমানাধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সবার প্রাপ্য। ক্ষুদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সমান পর্যায়ে উন্নয়ন না ঘটা পর্যন্ত, তাদের অগ্রাধিকারের মেয়াদ ভিত্তিক বিশেষ সুযোগ দানের মঞ্জুরি, বাংলাদেশ সংবিধানের বিধান নং- ২৮(৪) ধারায় সন্নিবেশিত আছে। তার আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থায় দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই উপজাতীয় রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর বিপরীতে সশস্ত্র বিদ্রোহ হলো চরম হটকারিতা। শান্তি-শৃঙ্খলা ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনে এই হটকারিতা দমন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এর বিকল্প হলো অস্ত্র ত্যাগ, বাড়াবাড়ি পরিহার, শান্তি অবলম্বন ও আনুগত্য। রাষ্ট্রের পক্ষেও কঠোরতা বর্জনীয়। তবে উপজাতীয় বাড়াবাড়ির বড় জবাব হলো তারা এ দেশের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়, বহিরাগত শরনার্থী বংশধর। এ কারণে বৃটিশ আমলে তাদের ভোটাধিকার ছিলো না।

৬. পার্বত্য বাঙ্গালী বনাম পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় জীবন

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এই তিন জাতি রাষ্ট্রের জন্ম ইতিহাসই এই উপমহাদেশে আরো আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র জাতি স্বাতন্ত্র্যের উৎসাহ ভিত্তি। সম্প্রদায়গত উত্তেজনার মুহূর্তে ১৯৪৭ সালে রেড ক্লিফ সাহেবের হাতেই অবাঙ্গালী অমুসলিম অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তখনই উত্থিত হয় স্থানীয় উপজাতীয় প্রতিবাদ, যার পরিণতি হলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। এটা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধাচারণও বটে। এই বিরুদ্ধাচারণের উৎপত্তির মূল ক্ষেত্র হলো ১৮৬০ সালে উপজাতীয় অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন। অথচ তখন এটিকে বাঙ্গালী প্রধান জেলায় পরিণত করা সম্ভব ছিল। তাতে বাংলাদেশকে আজ উপজাতীয় বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে হতো না। সেই বিভক্তিকালে পার্বত্য অঞ্চলের সংলগ্ন ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও রামু উপজেলার পূর্বাঞ্চলকে নতুন জেলার সাথে সংযুক্ত করা হলে অথবা গোটা চট্টগ্রাম পূর্ব-পশ্চিমে অথবা কর্ণফুলী বা শঙ্খের সীমারেখায় বিভক্ত করা হলে, জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক ভারসাম্যের সৃষ্টি হতো। তাই বলা যায় আজকের জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সংঘর্ষের কারণ ঐ অতীতের উপজাতি গরিষ্ট জেলাকরণ ও সুবিধাদান তথা বাঙ্গালীদের বিপরীতে পাহাড়ীদের মেরুকরণ।

মূলত বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। দেশের ৫০ হাজার বর্গমাইলের ওপর এই সত্য প্রযোজ্য। অবশিষ্ট ৫ হাজার বর্গমাইল হলো এর ব্যতিক্রম, যেখানে বাঙ্গালীরা সংখ্যালঘু। উপজাতীয় অঞ্চলের আনুগত্য লাভ, এই বাঙ্গালী রাষ্ট্রের পক্ষে প্রশ্নসাপেক্ষ। সংঘাত, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহের দ্বারা এটা একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৭২৪ সালে উপজাতীয় সামন্ত জালাল খান মোগল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৭৭৬-৮৬ আমলে চাকমা সর্দার শের দৌলৎ খান ও তদীয় পুত্র জান বখশ খান বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে চাকমা ও মগেরা ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলো। ১৯৭২ সালে শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটায়, যা ১৯৯৭ সালে চুক্তি ও আপোষ রফার মাধ্যমে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণের ধারায় দমিত হয়। পূর্ববর্তী তিন বিদ্রোহ সামরিকভাবে দমানো হলেও বাংলাদেশ আমলের বিদ্রোহটি সামরিক জয়ের মাধ্যমে নির্মূল করা হয়নি।

দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বিদ্রোহ একটি ধারাবাহিক আশংকার বিষয়।

তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়নে এখন এই অঞ্চল বাংলাদেশের সমপর্যায়ভুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি উন্নত। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই অঞ্চল এখন আর পশ্চাদপদ নয়। তবু ক্ষোভ-অসন্তোষের সুরাহা হচ্ছে না। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণই এখন উপজাতীয় নেতৃমহলের লক্ষ্য। আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীসভা পর্যন্ত পদ ও ক্ষমতা লাভ করেও তারা সন্তুষ্ট নন। আরো বড় রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যই তাদের কাম্য বলে অনুমান করা যায়, যা বাংলাদেশ ভাঙ্গা ও স্বতন্ত্র উপজাতীয় রাষ্ট্র গঠন ছাড়া সম্ভব নয়। ওই চূড়ান্ত পরিণতি থেকে বাংলাদেশকে বাঁচতে হবে। সুতরাং উপজাতীয় বিদ্রোহ আর বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচার জন্য জাতীয় নেতা শেখ মুজিবই সংবিধানে বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে রূপদান করে, দীঘি-নালা ও রুমায় সেনা ঘাঁটি স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন। তৎপর প্রেসিডেন্ট জিয়া ভূমিহীন বাঙ্গালীদের আবাসন গড়ার আদেশ দেন, যাতে দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ ও জনবিরল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহীদের অপতৎপরতা ও আত্মগোপন থেকে আবাদ হয়ে মুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিলো বিদ্রোহ ত্যাগ, আনুগত্য প্রদর্শন ও নিজেদের সংখ্যা প্রাধান্য রক্ষায় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা। বিপরীতে সংঘাত ও বিদ্রোহ জোরদারই হয়েছে। সুতরাং উপজাতিদের সংখ্যাগতভাবে দুর্বল করার লক্ষ্য অর্জনে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ছাড়া সরকারের হাতে আর কোন বিকল্প ছিল না। অতএব বলা যায়, উপজাতীয় বিদ্রোহেরই ফল বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। এই বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত করার মাঝেই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপজাতীয় বিদ্রোহের প্রতিকার নিহিত। এটা উপজাতি দমন নয়, দেশ রক্ষা ব্যবস্থা।

এখন সরকারের নীতি হওয়া উচিত উপজাতিদের সুযোগ-সুবিধা দান ও পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন এবং বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদেরও পূর্ন নাগরিক সুবিধা মঞ্জুর। পাহাড়ী-বাঙ্গালী উভয়ে মিলে এক জাতি, এই অনুভূতিতে এগিয়ে যেতে হবে। কারো প্রতি বৈষম্য আর অবিচার আরোপনীয় নয়। পার্বত্য চুক্তি সংবিধানের আওতাভুক্ত বলে ঘোষিত হওয়ায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অনুরূপ ত্রুটিগুলোর সংশোধন করা জরুরী।

পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের প্রতি সরকারীভাবে কিছু কিছু বৈষম্য ও অবিচার হচ্ছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে জমি বন্দোবস্ত বন্ধ রেখেছেন। শহর-বাজারে এই নিষেধাজ্ঞা পাহাড়ী বাঙ্গালী সবার প্রতি প্রযোজ্য। গ্রামাঞ্চলে এই নিষেধাজ্ঞা উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য হলেও পার্বত্য শাসন আইনের ৫০ ধারা বলে উপজাতিদের বেলায় তা ৩০ শতক পর্যন্ত শিথিল। কার্যত এই নিষেধাজ্ঞা জনস্বার্থবিরোধী। পাহাড়ী-বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়ই এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। এটা সংবিধানের ৪২ ধারার গুরুতর লঙ্ঘন, যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারও এই অধিকার লঙ্ঘনের বিরোধী। জমি-বাড়ি লাভ মানুষের মৌলিক চাহিদার বিষয়। সংবিধানের ১৫নং ধারা নাগরিকদের এই মৌলিক চাতিদা পূরণকে সরকারের দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছে।

এই সাংবিধানিক আইন লঙ্ঘন করা গুরুতর অন্যায়। ক্ষমতাসীনদের মাঝে এই অন্যায়বোধ না থাকা দুর্ভাগ্যজনক।

বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে সরকার ২৮ হাজার পরিবারকে তাদের বাড়িঘর ও জমি-জমা থেকে তুলে নিয়ে, নিরাপত্তা ক্যাম্পসমূহের পাশে, একেকটি ঘরের জায়গায় মাত্র পুনর্বাসিত করেন। পার্বত্য অঞ্চলে এভাবে অসংখ্য বাঙ্গালী গুচ্ছগ্রাম গড়ে উঠেছে, যাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল পরিবার প্রতি প্রদত্ত একটি ফ্রি রেশন কার্ড মাত্র। তাতে মাসিক বরাদ্দ ৮৫ কেজি ৭২ গ্রাম চাল অথবা গম। এ থেকে একটি কল্যাণ ফান্ডের জন্য ৫ কেজি কেটে রাখা হয়। গত বিশ বছরে বর্ণিত ২৮ হাজার পরিবার গুচ্ছ গ্রামবাসী ৫০ হাজার পরিবারের অধিক হয়ে গেছে। তাদের লোকসংখ্যাও দেড় লাখ থেকে বেড়ে প্রায় আড়াই লাখে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাড়েনি তাদের গৃহসংস্থান। সেই আগের ১০X১৫ হাতের জায়গাটিতে বাড়তি মানুষ ও পশু পাখি একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকে। রেশন কার্ডের সংখ্যাও বাড়েনি। অনাহার, অর্ধাহার, অশিক্ষা, অচিকিৎসার এক মানবেতর জীবনযাপনে তারা আবদ্ধ। পাহাড়ের এই বস্তিবাসী, শহরের বস্তিবাসীদেরও অধম। এদের কোন কর্মসংস্থানও নেই। গুচ্ছগ্রামবাসী রেশন কার্ডধারীদের ৫০% প্রায় অভাব, অসুবিধা রোগে-শোকে নিজেদের রেশন কার্ড হয় বন্ধক দিয়ে আর ফেরত নিতে পারেনি অথবা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন ওই ফ্রি রেশন ভোগ করছে স্থানীয় ভাগ্যবান দোকানী, মহাজন, ফড়িয়া ও মাতবর লোকেরা। গঠিত কল্যাণ তহবিলেরও হর্তাকর্তা তারা। স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটিতে ১৫/২০ জন স্থানীয় গণ্যমান্য লোকের ভেতর প্রকৃত কোন তহবিল মালিক নেই বললেই চলে। এ তহবিলে একেক উপজেলায় প্রায় কোটি টাকার মত জমেছে। কিন্তু ভুক্তভোগীদের কল্যাণে তা মোটেও ব্যয়িত হচ্ছে না। ভুক্তভোগী, দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন ইত্যাদি কাজে আজ পর্যন্ত একটি টাকাও ব্যয়িত হয়নি। তহবিল পরিচালকরা বড় বড় আশার বাণী শুনিয়ে কেবল বৃথা সান্ত্বনাই দেন। সন্দেহ হয়, সুযোগমত ঐ তহবিল পরিচালকরা একমত হয়ে ওই টাকাগুলো ভাগ করে খাবেন। মিল-কারখানা গড়ে তুললেও তাতে তাদেরই লাভ হবে। সমবায় বা সরকারী পরিচালনায় আজ পর্যন্ত কোন মিল-কারখানাই লাভজনক হয়নি।

পার্বত্য বাঙ্গালীরা দুর্দশা-দুর্ভোগের শিকার। তারা সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত। পার্বত্য চুক্তির বলে উপজাতিরা সংবিধান প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে অধিক পাচ্ছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য শাসন আইনে সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাঙ্গালীরা মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে অবিচার ও বৈষম্যের শিকার। সরকার ও প্রশাসন তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে। বাঙ্গালীরা সুবিচার পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র করণীয় হলো সুপ্রীমকোর্টের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া। সুপ্রিমকোর্ট একমাত্র কর্তৃপক্ষ যে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষায় সরকারকে বাধ্য করতে পারে।

পার্বত্য বাঙ্গালীদের মাঝে শিক্ষিত, সচেতন, বিত্তশালী লোকের অভাব। তবু তাদের দ্বারা সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টে বেশ কিছু মামলা দায়ের হয়েছে ও তা বিচারাধীন আছে। ওই মামলাগুলোর প্রায় সবই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের নিষ্ক্রিয়তা, তদবিরের অভাব এবং খরচ যোগানোর অসুবিধায় এগুচ্ছে না। বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের কল্যাণ তহবিল থেকেও এই মামলা সংক্রান্ত ব্যয় সংকুলান করা যেতো। কিন্তু তহবিল পরিচালনা কমিটি তৎপ্রতি অনীহ। এটি কি কারুনের ধন যে, মূল মালিক শুধু জমিয়েই যাবে এবং পরে লুটেপুটে খাবে ওঁৎ পেতে থাকা সুযোগসন্ধানী লোভীরা।

ঠিক একই ঘটনার শিকার ত্রিপুরা ফেরত উপজাতীয় শরণার্থীরা ও। তাদের খয়রাতী রেশন থেকেও একাংশ কল্যাণ তহবিলে জমা হচ্ছে। অনুমান তার পরিমাণ হবে কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু টাকাগুলো কি কোন কল্যাণ কাজে ব্যয় হচ্ছে বা হবে? এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই।
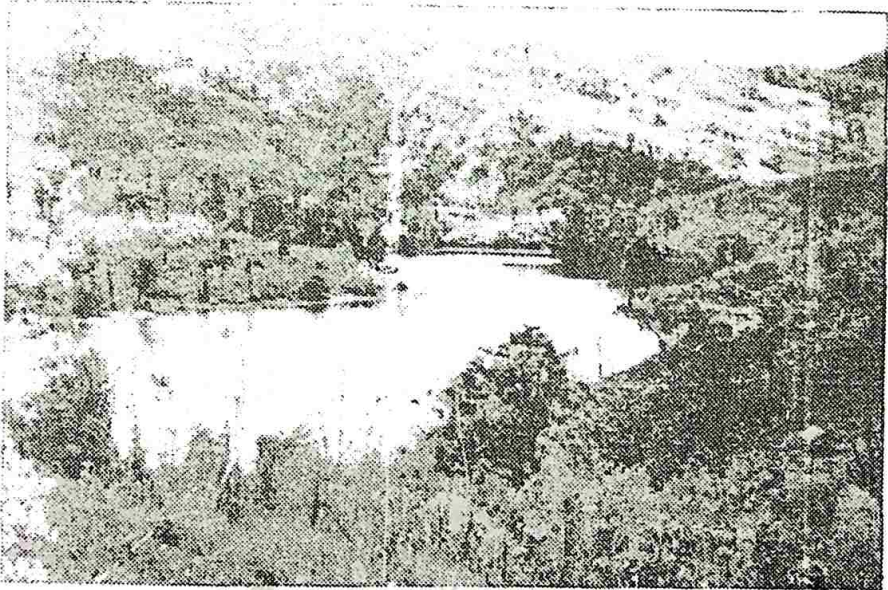
রইংখ্যং হ্রদ

৭. পার্বত্য পরিষদ সমূহের আইনী সংস্থান

(তাং শুক্রবার ৪ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ১৮ জুন ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী এককেন্দ্রিক এই দেশে দু'ধরনের শাসন ব্যবস্থা অনুমোদিত, যথা ঃ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন। অনুচ্ছেদ নং ১ এর বিধান বলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শাখা হলো বিভাগ জেলা, উপজেলা বা থানা প্রশাসন। এবং স্থানীয় কর্তৃত্বের শাখা হলো স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সম্বলিত কর্তৃপক্ষ, যথা ঃ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি। এই মূল্যায়নে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় শাসনভূক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই বিধান করা হয়েছে, আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব হবে ঃ

২২ (ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন..

(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্তাবধান ও সমন্বয় সাধন। (সূত্র ঃ পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইন)

এতদসত্বেও এই পরিষদ দুটির আইনী সংস্থান ও মর্যাদার ব্যাপারে প্রশ্নাদি বিদ্যমান। এখন পর্যন্ত কোন বিবরণে এটা পরিষ্কার নয় যে, সংবিধানের কোন আইনে এ দুটি গঠিত। যদি এ দুটি স্থানীয় শাসনের অধিক আরো বর্ধিত মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তা হলে কোন বিধান বলে, এ পরিষদগুলোর রাজনৈতিক মর্যাদা প্রাপ্য। সাংবিধানিকভাবে দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় না হওয়ায়, আঞ্চলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাজ্য মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু আঞ্চলিক মর্যাদায় এতদাঞ্চলকে উন্নীত করা হয়ে গেছে এবং এ থেকে পিছানো বিব্রতকর, সেহেতু এই আঞ্চলিক পরিষদকে বিভাগীয় মর্যাদায় সমুন্নত করাই স্বস্তিকর। স্থানীয় শাসন আইনেই এমনটি করা সম্ভব। নতুবা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক এককেন্দ্রিকতা রক্ষিত হবে না, এবং অসন্তুষ্ট ভিন্ন পক্ষীয়রাও প্রবোধ মানবে না। এ কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, রাষ্ট্রীয় শাসন প্রশাসন, ইউনিটারী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন বিষয়। রাষ্ট্রের ভিতর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করা ছাড়া অঞ্চল ভিত্তিক কর্তৃত্ব দান সম্ভব নয়। সে পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদ বা সরকারের মর্যাদা লাভের আশা সুদুর পরাহত। তবে স্থানীয় শাসন কাঠামোতে কিছু রদ বদল ও যোগ বিয়োগ সাধন সম্ভব। রাষ্ট্রকে ইউনিটারী রেখেও, শিথিল কাঠামোতে পূনরগঠন করা অসম্ভব নয়। এ নিয়ে সরকার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ভাবনা ও গবেষণার দরকার আছে।

আঞ্চলিক রাজনৈতিক আকাঙ্খা, গঠনমূলক হলে, তা অন্যায় নয়। বিপরীতে এক রোখা ও অসহিষ্ণু বিরোধিতা হলে, তাতে ধ্বংসাত্মক প্রবণতার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। রাষ্ট্র ও জাতিকে বহু অঞ্চল ও ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হতে হয়। এই গঠন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ও উদারতা অবশ্যই মান্য। ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন মতকে বৈরীতা ও ধ্বংস কামিতা বলে না ভেবে, তাকে গঠণমূলক রূপে গ্রহণ করাই উচিত। তাতে বিপক্ষদের দেশাত্মবোধ ও জাতিপ্রেম আহত হবে না এবং বিদ্রোহ ভাব হবে স্তিমিত। উভয় পাক্ষিক অসহিষ্ণুতাই, হানাহানি ও বিদ্রোহের কারণ হয়। শুধু এক পাক্ষিক আত্মস্বার্থ চিন্তা, ও তার পক্ষে বীরত্ব প্রদর্শন, বৃহত্তর মঙ্গলসাধনের উপযোগী কাজ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এরূপ নীতি আদর্শের প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন সারাদেশের জন্য উদাহরণ হয়ে গেছে। এখন সাবেক বৃহত্তর জেলাগুলো আঞ্চলিক পরিষদের গঠনতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবে। জেলা পরিষদ তো মঞ্জুর হয়ে আছেই। এখন বিবেচ্য হবেঃ পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ে কম ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধায় অন্যরা রাজি হবে কি না। স্থানীয় শাসন ক্ষমতা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট রূপে গঠিত হতে হবে। যেমন পার্বত্য অঞ্চল তেমন অধিকাংশ সাবেক জেলা এখনো ডিভিশনে উন্নীত হয়নি। স্থানীয় শাসন আইনে সর্বত্র আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করতে হলে, সর্বাগ্রে সাবেক জেলাগুলোকে ডিভিশনে উন্নীত হতে হবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন আইনে এই পরিষদগুলো পরিচালনার চিন্তা ভাবনা থাকে, তা হলে এখনই পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, ঐ ভিন্ন আইনগুলো কী। নতুবা অসন্তুষ্ট পক্ষের আইনী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, এই পরিষদীয় সম্ভাবনাটির সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে আইনী চ্যালেঞ্জ ওৎ পেতে আছে, তা বলাই, বাহুল্য। পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবস্থাটির প্রবর্তন কালে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দেশটি যুক্তরাষ্ট্রীয় না এককেন্দ্রিক চরিত্র সম্পন্ন তা হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবেন। অন্ততঃ প্রশাসনিক কাঠামোকে অজ্ঞতাবশতঃ ফেডারেল ব্যবস্থা বলে ভাবা হয়ে থাকবে। যদ্দরুণ ভিত্তিরূপে আঞ্চলিক পরিষদের জন্য প্রশাসনিক অঞ্চল থাকা জরুরী একথা অনুভুত হয় নি। কিন্তু এই শূন্যতা সাংবিধানিক বলে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আঞ্চলিক পরিষদ না ফেডারেল, না ইউনিটারী কর্তৃপক্ষ। এর কোন প্রশাসনিক স্থিতি ভিত্তি নেই।

উভয় পরিষদ নিয়ে আরেকটি আইনী প্রশ্ন উত্থাপন যোগ্য। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে আইনতঃ তিন বছর মিয়াদের জন্য তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচিত হয়ে গঠিত হয়েছিলো। বর্তমান জেলা পরিষদগুলো তারই এক প্রতিভু লাশ। এখন নতুন নির্বাচিত পরিষদের কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত এগুলো অন্তরবর্তীকালীন দৈনন্দিন কার্য নির্বাহী পরিষদ। নির্বাচিত পরিষদের সমান নীতি নির্ধারনী ক্ষমতা এগুলোর প্রাপ্য নয়। কিন্তু কার্যতঃ এই মনোনীত পরিষদগুলো আইনী ক্ষমতা বহির্ভূত সব কাজই করছে। তাদের আয়ু কখন শেষ হবে তাও অনিশ্চিত। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন ছাড়া, অনির্বাচিত মনোনীত দীর্ঘজীবী পরিষদগুলোর বাড়তি ক্ষমতা ভোগ কি বিধি সম্মত? এই বাড়তি ক্ষমতা চর্চার

উদাহরণ হলো প্রবিধান রচনার মাধ্যমে তারা বেতন ভাতাকে দ্বিগুন তিনগুণ বাড়িয়েছেন। নগদ ও খাদ্যশস্যে প্রাপ্ত অনুদানের বিলি বন্টন ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা মোটেও পালন করছেন না। দূর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্বাচন হীন লাগাতার ক্ষমতা ভোগের এই উদাহরন আঞ্চলিক পরিষদের সামনেও দোদুল্যমান। আদৌ কোনদিন নির্বাচন ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা হবে কিনা কে জানে? এগুলো লাগাতার মাথাভারি খাই খাই পরিষদ হয়ে আছে। জরুরীভাবে অবিলম্বে চলতি ভোটার লিষ্টে এখনই কেন নির্বাচন নয়? দাবী অনুযায়ী সংশোধিত ভোটার লিস্ট করা অনিশ্চিত। জেলা পরিষদ আইনে বাঙ্গালীদের স্থানীয় স্থায়ী নাগরিকত্ব সম্পন্ন ভোটাধিকারের যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাতে সংবিধানিক আইন লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং সংক্ষুব্ধ বাঙ্গালীদের পক্ষে ঐ আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা হওয়া সম্ভব। বাঙ্গালীদের ভোটাধিকার প্রশ্নে এখনই উপজাতীয় আপত্তি ও বাঁধার কারণে ভোটার করণ ও নির্বাচন অনুষ্ঠান আটকে আছে। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন ছাড়াই বর্তমান অন্তরবর্তী জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের লাগাতার ক্ষমতা ভোগ করে যাওয়াই হবে ভাগ্য লিপি। পরিষদগুলোর আয় দফায় দফায় বাড়ছে। অথচ আইনে নির্বাচনই ক্ষমতার উৎস। মনোনীত পরিষদের কোন বিধান সংবিধানে নেই। এবং অন্তরবর্তী পরিষদের পক্ষেও অনির্দিষ্ট দীর্ঘ কার্যকাল ক্ষমতা ভোগ অনুমোদিত নয়। সুতরাং আপাততঃ চলতি ভোটার লিষ্টে জরুরী ভিত্তিতে যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন সমাধান করাই সঙ্গত। তাতে পরিষদগুলোর আইনী বৈধতা অর্জিত হবে।

জনসংহতি সমিতির দাবীনামার প্রথম দফায় সঠিকভাবেই সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষ দাবী উত্থাপিত হয়েছিলো। কিন্তু চুক্তিকালে নেতৃবৃন্দ এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আঞ্চলিক পরিষদ বাস্তবে আইনী ঘোর প্যাঁচে পতিত হচ্ছে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলা ভিত্তিক একক কোন প্রশাসনিক ইউনিট বিদ্যমান নেই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন নিদিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্র নয়। এই দৃষ্টিতে আঞ্চলিক পরিষদ হলো ভূমি এখতিয়ার মুক্ত এক বায়বীয় কর্তৃপক্ষ। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ক্ষমতা কেন্দ্র নয়। জেলার উপর এটা কোন উধ্বতন প্রশাসনিক ইউনিটও নয়। সেহেতু এ নামের কোন কর্তৃত্ব অধঃস্তনদের পক্ষে মান্যও নয়। আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বকে এ বলে অমান্য করা যাবে। তাই আঞ্চলিক পরিষদের টিকে থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন এটাকে বিভাগীয় মর্যাদায় উন্নীত করা এবং তাকে বিভাগীয় তত্ত্বাবধান ও সমম্বয়ের ক্ষমতা দান ছাড়া এই ক্রটির কোন সমাধান কল্পনীয় নয়।

সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে যদি এরূপ একটি উপ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা যেতো যে, উপজাতি সমাজ ও তাদের অধ্যূষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অপ্রশাসনিক ইউনিট রূপে বিশেষ সুযোগ সুবিধা অগ্রাধিকার, তত্ত্বাবধান ও সমম্বয় মূলক পারিষদীয় ক্ষমতা ভোগ করবে। তা হলে কোন আইনী ঝামেলাই পোহাতে হতো না। এই ব্যবস্থার অবর্তমানে এখন আঞ্চলিক পরিষদকে সাংবিধানিকভাবে জায়েজ করতে একমাত্র গ্রহণীয় উপায় হলো অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষে পরিণত করা,

এবং তা তখনই যথাযথ হবে,যখন তিন পার্বত্য জেলা মিলে হবে একটি ডিভিশন । তখন নামে আঞ্চলিক পরিষদ হলেও কার্যতঃ তা হবে বৈধ এক বিভাগীয় পরিষদ ।

সর্বোপরি, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে জাতীয় স্থানীয় শাসন আইনের সাথে সঙ্গতিশীল হতে হবে । তখন অনেক যোগ বিয়োগ মেনে নেয়ার ও প্রয়োজন হবে । নতুবা এটিকে জাতীয়ভাবে মানিয়ে নেয়া কঠিন হতে পারে ।

বৃহস্পতিবার ১০ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ২৪ জুন ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙামাটি

এই প্রবন্ধের শিরোনামভূক্ত প্রশ্নটি যথেষ্ট জটিল । এটি সাংবিধানিক আইন সরকার ও রাজনীতি বিজ্ঞানভূক্ত তাত্বিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট । তবু সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের আগ্রহ মিটাতে আরো কিছু আলোচনা দরকার ।

মনোনীত আর অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী পরিষদের ক্ষমতা দৈনন্দিন কার্যসম্পাদনে সীমাবদ্ধ থাকবে এ কথাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে লিখিত নেই । এ হেতু এই পরিষদদ্বয়ের মৌলিক নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা আছে এ বলা সঠিক নয় । বাংলাদেশ সংবিধানের তত্বাবধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ নং ৫৮ (ঘ) হলো এতদসংক্রান্ত আইনী উদাহরণ যথা ঃ

"(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না । (সূত্র ঃ বাংলাদেশ সংবিধান)

এই আইনী উদাহরণের ভিত্তিতে এ বলা সঙ্গত যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচিত নয় বলে, তা মনোনীত অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক বা কার্যনির্বাহী অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ । এগুলোর দায়িত্ব হলো দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন । নীতি নির্ধারণ ও প্রবিধান রচনার কোন বৈধ এখতিয়ার এগুলোর নেই । এমতাবস্থায় এগুলোর দ্বারা এ যাবৎ সম্পাদিত ও গৃহীত সমুদয় নীতি নির্ধারনী কার্যাবলী ও প্রবিধানাদি বেআইনী হয়েছে । এসবের দায় দায়িত্ব সংস্থাদ্বয়ের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উপর বর্তায় । এবং এজন্য তাদের জবাবদেহী হতে হবে । তাদের এই ক্ষমতা বহির্ভূত বেআইনী কাজে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাহী কর্মকর্তাদের নীরব সমর্থন ও সহযোগীতা প্রমাণিত হলে, দায় দায়িত্বের ভাগ তাদের উপর ও বর্তাবে । সরকারী সম্পদ সম্পত্তি অর্থ কড়ি ব্যয় ও বিনিয়োগ এই তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত বলে তার ক্ষতিপূরণ ও আদায় যোগ্য হবে । অজ্ঞতা ও অসতর্কতার অজুহাত পার পাওয়ার যোগ্য হবে না ।

পরিষদগুলো বিধিবদ্ধ সংস্থা । এগুলোর প্রকৃতি প্রতিনিধিত্বমূলক । নির্বাচনই যার মৌলিক সাংগঠনিক ভিত্তি । বিধি বহির্ভূত অনিয়মতান্ত্রিক কোন কর্মকান্ডই তাতে অন্তর্ভূক্ত নেই । এই মৌলিকতার বিচারে মনোনীত পরিষদ আর অন্তর্বর্তী পরিষদ, কোনক্রমেই

স্বয়ং সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ পরিষদ নয়। এগুলো অনির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী হতেও পারে না। হয় অবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যতা পূরণ করতে হবে, নয়তো তত্ত্বাবধায়ক পরিষদগুলো ভেঙে যাবে। সরকারের কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার পক্ষে অগণতান্ত্রিকভাবে দীর্ঘকাল বা অনির্দিষ্ট দীর্ঘ মিয়াদ কাল যাবৎ টিকে থাকাও সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ আইন সম্মত নয়। রাজনৈতিক বা নির্বাচনী জটিলতা, দীর্ঘমান্য অজুহাত রূপেও গণ্য হতে পারে না। রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক কাঠামো নিম্নোক্ত সাংবিধানিক আইনে গঠিত যথাঃ

"বালাদেশ সংবিধান প্রথম ভাগ। প্রজাতন্ত্র। অনুচ্ছেদ-১। বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।"

এই মৌলিক আইন দেশের কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে যুক্ত রাষ্ট্রীয় ধরণের আঞ্চলিক ক্ষমতা ভোগের অধিকার দেয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামোগত ক্ষমতার ভিত্তি কি ইউনিটারী না ফেডারেল ? পরিষদ আইনে বিষয়টি পরিস্কার নয়। যেহেতু দেশ সাংবিধানিকভাবে ফেডারেল নয়, সুতরাং আঞ্চলিক ভাবে ফেডারেল ক্ষমতা ও প্রদানযোগ্য নয়। তাতে সৃষ্ট শূন্যতার বিকল্প বলেও কিছু নেই।

ইউনিটারী সাংবিধানিক ব্যবস্থায়, স্থানীয় শাসন আকারে, একটি বিকল্প ব্যবস্থা রাখা আছে, যা বর্ণিত পরিষদ সমূহের ব্যাপারে একমাত্র প্রয়োগযোগ্য ব্যবস্থা। আর সে হলো সাংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদ, যথাঃ "(১) আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে।

ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য, (খ) জন শৃংখলা রক্ষা, গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।"

এই সাথে সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৯ ও ৬০ আরো জোরদার সমর্থন ব্যক্ত করে যথাঃ

"অনুচ্ছেদ নং -৯। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।"

"অনুচ্ছেদ নং ৬০ ঃ এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও

নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"

এখন প্রশ্ন হলোঃ বর্ণিত পরিষদ আইন দেশ ও জাতি ভিত্তিক সার্বজনীন ও অবাধ গণতান্ত্রিক নয়। উপজাতিভূক্ত লোকদের জন্য এটিতে পদ সংরক্ষণ বিশেষ ক্ষমতা ও অগ্রাধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭, ২৯, ও ৩১ অনুমোদন করে না। সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গিকার ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অথচ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে তার ধারাবাহিকতা নেই যথাঃ

সাংবিধানিক আইন ঃ "প্রস্তাবনা। আমরা আরো অঙ্গিকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

"অনুচ্ছেদ ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

"অনুচ্ছেদ ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।"

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্তের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্ননের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

"অনুচ্ছেদ ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"

"অনুচ্ছেদ নং ২৯।

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

"(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।"

এই মৌলিক বিধানগুলো স্থানীয় পরিষদ আইনে বিভিন্নভাবে লজ্ঘিত হয়েছে, যথা ঃ পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও পরিষদ সমূহে মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান পদে বাঙ্গালীদের অযোগ্য করে বিধান করা হয়েছে। সংখ্যানুপাতিক জন প্রতিনিধত্ব বাঙ্গালীদের নেই। মাত্র তিন ভাগের ১ ভাগ সদস্য পদই তাদের প্রাপ্য। এটি অবাধ গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতি লঙঘন। সুতরাং সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ধারা নং ১১ তদ্বারা সুস্পষ্টভাবে লজ্ঘিত হয়েছে। জমি বন্দোবস্তি,

লাইসেন্স পারমিট প্রদান ও কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতিদের অগ্রাধিকারের বিধান, সংবিধানের ধারা নং ১৯, ২৭, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এর প্রকাশ্য লঙ্ঘন। অনুচ্ছেদ ২৮ (৩) ২৯ (৩) এর বিশেষ ছাড়ও সুবিধা দানের আওতায় অনগ্রসর লোকজন ধর্মীয় আর উপসম্প্রদায়ভূক্ত কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার ও পদ সংরক্ষণের সুবিধা লাভের অর্থঃ মৌলিক অধিকার হরণ নয়। অনুচ্ছেদ ২৬ (১) এর বিধান মতে, অনুরূপ আইন আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে, বা মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন অংশ রহিত হয়ে যাবে যথাঃ

"অনুচ্ছেদ নং- ২৬। এই ভাগের বিধানবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, এই বিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।" (সূত্রঃ সংবিধান, তৃতীয় ভাগ-মৌলিখ অধিকার)

এভাবে চীফদের নির্বাহী ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের স্থানীয় স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার সার্টিফিকেট দানের ক্ষমতা দান, সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত কাজ। সরকারী নির্বাহী ক্ষমতা ছাড়া কারো পক্ষেই জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব প্রাপ্য নয়।

১৫ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ২৯ জুন ১৯৯৯/খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙগামাটি)

এটা নিঃসন্দেহ যে, বিশুদ্ধ এক ইউনিট ভিত্তিক বাংলাদেশে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও ক্ষমতা দান অসাংবিধানিক। আইনতঃ এটা পরিস্কার যে, পার্বত্য পরিষদীয় ক্ষমতা কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই স্থানীয় শাসন ভূক্ত বিষয়। আসলে যদি বিষয়টি তা-ই-হয়, তাহলে এ পরিষদগুলো স্থানীয় শাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন না হয়ে, আগে ছিলো স্পেশাল মন্ত্রনালয়ের অধীন এবং এখন আছে নব সৃষ্ট পাবত্য মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রিত, এ লোকচুরি যথার্থ নয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ঃ জাতীয়ভাবে প্রযোজ্য সাধারণ জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরষদ আইন এখনো রচিত হয় নি। যদি তা পার্বত্য আইন থেকে ভিন্ন হয়, তখন বিশেষ কোন অন্জল ও সম্প্রদায় আইনগত প্রশ্রয় পাবে না। যদি পার্বত্য আইন ও সুযোগ সুবিধা ক্ষনস্থায়ী কিছু হয়, তা হলে উপজাতিদের সাময়িক রাজা উজির বাণিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই। আর যদি তা স্থায়ী ব্যবস্থা রূপে চিন্তা করা হয়ে থাকে, তখন ব্যবস্থাটিকে সার্বজনীন কল্যাণ অর্থেই সংগঠিত হতে হবে। ব্যবস্থাটির দুর্বলতা হলোঃ এটি কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই নানাভাবে সাম্প্রদায়িক, পক্ষপাতদুষ্ট, অগণতান্ত্রিক ও একপেশে ব্যবস্থা। স্থানীয় ও সাময়িক ভাবে এর পক্ষে হাততালি জুটলেও পরিণামে এটি হবে কালান্তর। এর প্রবক্তারা ক্ষণস্থায়ী লাভের চিন্তায় মগ্ন। লক্ষ্য অর্জনের পর, হয় তারা নিজেরাই এর মুন্ডপাত করে যাবেন, নয়তো ক্ষমতাসীন বিপক্ষের হাতে তাকে কাতল হতে দিবেন।

প্রশ্ন হতে পারেঃ গোপন লক্ষ্যটা কী?

উত্তর হলোঃ দলীয় রাজনীতির সাফল্য হিসাবে গোলযোগ পূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের কৃতিত্ব প্রদর্শন। জাতীয় নির্বাচন মুহূর্তে বিরূপ জনমতকে বাগে আনতে কৌশল হবেঃ চুক্তির সাফল্য ও শান্তি প্রদর্শন, তৎপর গৃহশক্র বিভীষণদের বলিদান। ভোট আর ক্ষমতা লাভের পর এক ফুৎকারে উবে যাবে শান্তি চুক্তি পরিষদীয় আইন ও উপজাতীয় ক্ষমতা। পক্ষে বিপক্ষে মাঠ গরম করার ইস্যু এটি। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের পক্ষে বাঙ্গালী স্বার্থের বিরোধীতা করে, ক্ষমতায় ফেরার আশা অবাস্তব কল্পনা। তাই এ

কথা ভাবাই সঙ্গত যে, তাদের পার্বত্য রাজনীতি সব দেয়ার চাতুর্থ ও ফাঁকি সম্বলিত। কেড়ে নেয়ার শেষ খেলাটি বাকি। হয় বশংবদ লেজুড়ে পরিণত হতে হবে, নয়তো মেনে নিতে হবে সব সংশোধন। এ ভাবে সন্তু বাবুদের মহা ফাপরে পড়া আসন্ন।

আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি, উচ্চাভিলাষী চিন্তা পরিহার করুন। ঢালুতে অবস্থিত বাংলাদেশটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার আধিবাসীদের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ এই পর্বতাঞ্চল ও তার অধিবাসীদের ভাগ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বন্ধন জন্মগত। উভয়কে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতায় এগুতে হবে। সাম্প্রদায়িক বৈরীতা বৈষম্য ও উত্তেজনা নয়, সমানাধিকার ও একক রাজনৈতিক লক্ষ্যে সম্মিলিত আন্দোলনেই সাফল্য অর্জন সম্ভব। উপজাতীয়দের এক পাক্ষিক আন্দোলন সাফল্য অর্জনে কখনো সক্ষম হবে না। বিপরীতে ঐক্যবদ্ধ পাহাড়ী বাঙ্গালী আন্দোলন হবে দূর্বার। তাকে কখনো দমান যাবে না। কঠিনতম রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে এই ঐক্য হবে সফল শক্তি। আদি আর নবাগত বিভক্তি নয়, সম্মিলিত পাহাড়ী বাঙ্গালীর আন্দোলনে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমাদর ও সাফল্যেরও সম্ভাবনা প্রচুর। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন রাজনৈতিক সাফল্যের স্বর্ণদ্বার রূপে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

ধর্মান্ধতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগ শেষ। একক ধর্ম বর্ণ সমাজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীগোষ্ঠীভূক্ত লোক অধ্যুষিত দেশ ও জাতি গঠনের চিন্তা অবাস্তব। বিবিধের সহাবস্থানে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দেশ ও জাতি হয়ে থাকা এবং গড়ে ওঠার চিন্তা চেতনাই সঠিক। প্রত্যেক অন্যায় অবিচারকে মানবিক ও আইনী দৃষ্টিকোণের বিচারে দেখে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। হিংসা বিদ্বেষ ও হানাহানিতে তিক্ততাই বাড়ে, সমস্যার সমাধান হয় না। এ সংশোধিত পথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অগ্রপদক্ষেপ কাম্য। সাধারণ বাঙ্গালীরা তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। সাম্প্রদায়িক একপেশে নীতি ও রাজনীতিটাই, ঐক্যের পথে বাধা। পর্বতাঞ্চলের আঞ্চলিক ও স্থানীয় রাজনীতিকে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির অঙ্গিভূত করা না গেলে, বিচ্ছিন্নতার সন্দেহ আর অবিশ্বাস দুরীভূত হবে না, যে সন্দেহ অবিশ্বাস জাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ করে রেখেছে। তা থেকেই বিদগ্ধ পক্ষ ভাবছেনঃ ক্ষমতায় গেলে তারা এই একপেশে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন।

পার্বত্য বিধি ব্যবস্থাকে জাতীয়ভাবে গ্রহণীয় আইনীরূপ প্রদান দরকার। যদি পরিষদীয় কাঠামোটি সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, ও সার্বজনীন হয়, আর এটি হয় জাতীয়ভাবে গ্রহণীয় একটি মডেল, তখন সন্দেহ অবিশ্বাস ও নেতিবাচক চিন্তা চেতনা বিদুরিত হবে। ব্যবস্থাটির স্থায়িত্বের জন্য, এরূপ উদার পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। আর এ উদ্যোগটি উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আসাই উপযোগী। কারণ অন্যরা সন্দেহে আক্রান্ত।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অভিযোগ আর অসন্তোষের মাত্রা কমান দরকার। তারা এখন সরকারী আনুকুল্য স্নাত বরপুত্র। যারা তাদের ক্ষমতাসীন করেছেন, এবং বালা মুছিবত থেকে বাঁচিয়ে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখছেন, প্রতিনিয়ত তাদের দোষারোপ ও গঞ্জনা দান

অসঙ্গত। অলিখিত চুক্তির নামে বাঙ্গালী প্রত্যাহার সেনা ক্যাম্প সীমিত করণ, ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রথাগত ভূমি মালিকানা, জেলা প্রশাসকদের নির্বাহী ক্ষমতার সংকোচন, বাঙ্গালীদের দখল ও অধিকার থেকে জমিজমা মুক্তকরণ, চীফদের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দান, চাকুরী ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে অগ্রাধিকার ইত্যাদি দাবী অবাঞ্ছিত। এগুলো ঐক্য, সদিচ্ছা ও সাফল্যের পথে বাঁধা।

পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি শৃংখলা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় সেনাবাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ থাকা অপরিহার্য। এখনো স্থানীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কটি উত্তপ্ত। এখনো শান্তি চুক্তি বিরোধী একদল উপজাতীয় নব্য বিদ্রোহী মারমুখী। বহির্দেশীয় অনেক সশস্ত্র বিদ্রোহী সীমান্তের পাহাড়ে জঙ্গলে গোপনে ঘাঁটি গেড়েছে ও উৎপাতে লিপ্ত। জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর অস্ত্র মুক্ত সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনযাপনে হুমকির সম্মুখীন। পুলিশ বিডিআর আনছার ইত্যাদি শান্তি রক্ষী বাহিনীগুলোর শক্তি ও সামর্থ, বিপদ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। দুর্গম অঞ্চলকে জেলা সদর থেকে তৎক্ষণাত নিয়ন্ত্রণ করা ও অসম্ভব। সুতরাং শান্তি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে সর্বত্র সেনা বাহিনীর নিয়োজিত থাকা এখনো জরুরী।
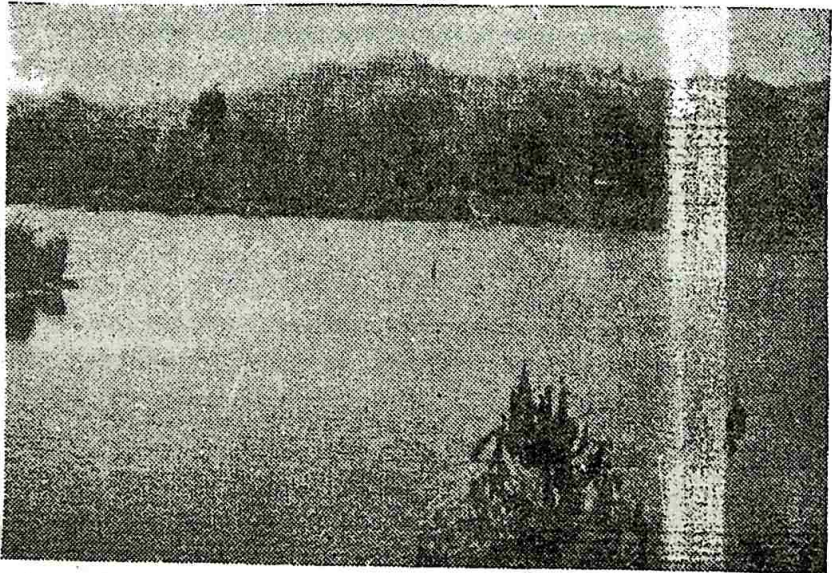
বগা হ্রদ

৮. আদি অনাদি রহস্য

আদি বাসিন্দা আর আদিবাসী সংজ্ঞাদ্বয়ের ভিতর অর্থগত তফাৎ আছে। আদি বাসিন্দা অর্থ অনেক দীর্ঘ অতীত কাল থেকে বসবাসরত লোক। আদিবাসী অর্থঃ ঐ সব আদিম স্বদেশী লোক, যারা সভ্যতা বিবর্জিত, টাবু মানে ও টুটেমে বিশ্বাস করে। টুটেম হলোঃ জন্তু-জানোয়ার, বস্তু, ফলমূল জাত পূর্ব পুরুষের ধারণা, আর টাবু হলো ঐ পূর্ব পুরুষ-মূলের ব্যক্তি বস্তু ফল মূল জন্তু জানোয়ারকে আহার ও পানীয় করা বর্জন এবং সম মূল থেকে স্ত্রী ও স্বামী গ্রহণ না করা এই নিষেধাজ্ঞা। এই অর্থের ভিত্তিতে বাঙ্গালীরা আদিবাসী নয়, তারা আদি বাসিন্দা। বাঙ্গালীদের আদি অনন্তকালের স্বদেশ বাংলাদেশ। তাদের এই আদিবাস ও স্বাদেশিকতা পার্বত্য চট্টগ্রামেও বিস্তৃত। বাঙ্গালী অধ্যুষিত বৃহত্তর বাংলা ভূখন্ডের সংলগ্ন বাহির অঞ্চলেও বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল আছে, যেমন বিহারের পূর্নিয়া, আসামের গোয়াল পাড়া ও কাছাড়, এবং উত্তর আরাকানের মংডু ও আকিয়াব। বাঙ্গালীরা আসাম ও আরাকানে অভিবাসী বলে, স্থানীয়ভাবে বাঙ্গাল-খেদা আন্দোলনের শিকার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, খোদ বাঙ্গালীর স্বদেশ ভূমি বাংলার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও বাঙাল খেদা আন্দোলন সক্রিয় এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদি মালিক চট্টগ্রামী বাঙ্গালীরাও নিজেদের আদি মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে উপজাতিদের দ্বারা উপেক্ষিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কখনো বিদেশী ভূখন্ডরূপে চিহ্নিত ছিলো না। অতীতে এটি এবং সমতল চট্টগ্রাম অঞ্চল কখনো আংশিক আর কখনো সার্বিকভাবে হয় আরাকানী নয় তো ত্রিপুরী দখলাধীন হয়েছে। পরে মুসলিম ও বৃটিশ রাজশক্তি এতদোভয় অঞ্চল দখল ও শাসন করেছে। কিন্তু এতদাঞ্চল কখনো ভিন দেশ হয়নি এবং ছিলো না। বিদেশী বিজাতীয় দখলকালেও এতদাঞ্চল ছিলো চট্টগ্রাম, বাংলা ও বাঙ্গালীর আপন ভূমি। প্রশাসনিকভাবেও এর বাংলা পরিচিতি অব্যাহত ছিলো। ভৌগোলিকভাবেও এটি চিরকাল ছিলো অখন্ড চট্টগ্রাম ও বাংলার ভূখন্ড। তাই এটিকে কোনদিন আরাকান, ত্রিপুরা, ও লুসাই অঞ্চলের সাতে সংযুক্ত করা হয়নি। এর বাংলা ভূচরিত্র আগে পরে অক্ষুণ্ন রেখে বাংলার সাথে আগাগোড়া চিরকাল সংযুক্ত করে রাজনৈতিক ভাগ্য নিরূপণ করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবেও পাহাড় ও সমতল মিলে বৃহৎ চট্টগ্রাম পরস্পর নির্ভরশীল। আরাকান, লুসাই ও ত্রিপুরা এর ক্রমিক উচ্চ ও দূর্গম পশ্চাদভূমি। মানব বসতির বিচারেও বটে এই অঞ্চলগুলো বিরূপ স্বভাব ও ভাষা চরিত্র সম্পন্ন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম যেমন আদি চট্টগ্রামী বাংলা ভূমি, তেমনি এর

পশ্চাদ অঞ্চল আদি অবাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকারূপে পৃথক । এতদাঞ্চলে অবাঙ্গালী সংখ্যা প্রাধান্য বৃটিশের সৃষ্ট কৃত্রিম । ঐ আমলে বিজাতীয় অভিবাসন না ঘটলে, আর পৃথক জেলা রূপে উত্তরে দক্ষিনে সীমারেখা টানা না হলে, এখনো অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হয়েই থাকতো । এখন পুনরায় চট্টগ্রামের সাথে এলাকা যোগ বিয়োগ করে, প্রশাসনিক অঞ্চল পূনর্গঠন করা হলে, অবাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা তছনছ হয়ে যাবে, যা প্রয়োজনে করা অসম্ভব নয় । সংখ্যায় কম হলেও চট্টগ্রামীরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা । উপজাতিরা নিজেদের আদিবাসী দাবী করে, অথচ সে সংজ্ঞাটির তাত্বিক অর্থ হলো স্থানিয় আদিম অসভ্য আদি বাসিন্দা । মৌলিকভাবে তারা চট্টগ্রামী মূলের লোকও নয় ।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম পর্বতে ও সমতলে বিস্তৃত । পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বিকল্প কোন নাম পরিচয় নেই । ১৮৬০ সালে পর্বতে সমতলে বিভক্ত হয়ে দুই স্বতন্ত্র জেলা বা অঞ্চলে পরিণত হলেও, উভয় অঞ্চল পরিচয়মূলক মৌলিকত্বকে ধারণ করে, এখনো পর্বত ও সমতল বিশেষণ নিয়ে সেই আদি ভৌগোলিক চট্টগ্রাম নামে পরিচিত । চট্টগ্রাম চাটিগাঁ আর চিটাগাং যা-ই বলা হোক না কেন, এই নামের বাহিরে তার কোন ভিন্ন পরিচয় নেই । এই আঞ্চলিক নাম পরিচয়, ভূগোল ও ইতিহাস খ্যাত প্রাচীন । দক্ষিণ পূর্বে লুসাই আরাকান উত্তরে ফেনী নদী আর পশ্চিম জুড়ে বঙ্গোপসাগর । এই চৌহদ্দির ভিতর অবস্থিত ভূভাগটি সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম । এই ভূভাগের আদি ও খাঁটি বাসিন্দা চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী । এই চট্টগ্রামী মৌলিকত্বের বিস্তৃতি ও অধিকার অবিতর্কিত । এই ঐতিহাসিক মৌলিকত্ব চ্যালেঞ্জযোগ্য নয় । প্রশাসনিক বিভক্তি আর অঞ্চল ভাগ সত্ত্বেও, চট্টগ্রামী অধিকার ও মৌলিকত্ব অভিভক্ত আছে । অধুনা মূল ভূখন্ডের বিভক্ত পর্বতাংশে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভুক্ত জনসংখ্যার প্রাধান্য ঘটার হেতু অভিবাসন । আর অভিবাসন জাত সংখ্যা প্রাধান্যে মৌলিকত্ব রদ বা রহিত হয়না । মূল চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার বলে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সর্বক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য । পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের উপেক্ষিত আর পরবাসীর মর্যাদা নিতান্তই অগ্রহনীয় । চট্টগ্রামীদের এই মর্যাদার প্রশ্নে অবশ্যই আন্দোলন হতে পারে । তাদেরতুলনায় উপজাতি বা অবাঙ্গালীরা নিতান্তই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ও বহিরাগত লোক । তারা চট্টগ্রামীদেরই আশ্রিত জন । প্রশাসনিক কারণে অঞ্চল বিভক্তি, আর জুম কৃষির জন্য পাহাড় বাসের বদৌলতে, সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে পার্বত্য প্রান্তে অবাঙ্গালীরা প্রাধান্য লাভ করেছে । অথচ প্রশাসনিক ভাগ মানে, বাঙ্গালী আর অবাঙ্গালী দুই পৃথক জনগোষ্ঠীর মাঝে অঞ্চল ও এলাকা বন্টন নয় । এখন কৌশলে তা-ই দাবী করা হলে, এই কাবু নীতির জবাব হলোঃ অবাঙ্গালী উপজাতিরা বৃটিশ আমলের বহিরাগত আদিবাসী বংশধর । বৃটিশ আমলের ইতিহাসে তাদের অভিবাসন স্বীকৃত । তারা মিঃ কক্স লালিত আরাকানী শরণার্থী, আজ বিতাড়িত ও আশ্রিত জনগোষ্ঠীর আধুনিক প্রজন্ম । মূল বাসিন্দার মত দেশের উপর কোনরূপ মৌলিক ভূম্যাধিকার বা অগ্রাধিকার তাদের কারো পক্ষেই প্রাপ্য নয় । দেশের মানুষ তাদের সে অধিকারে সীমাবদ্ধতা আরোপের অধিকারী । অনুরূপ বৈষম্যের পথ প্রদর্শক তারা নিজেরাই ।

এটা দুঃখজনক সত্য যে, পার্বত্য সংকট আর উপজাতীয় বাড়াবাড়িতে ও সমাধানের ঐতিহাসিক পথ খোঁজার প্রতি দেশ ও জাতি উদাসিন। চট্টগ্রামীরাও আত্মবিস্মৃত জনগোষ্ঠী। উপজাতিরা মূল দেশী জনগোষ্ঠী নয়। নিকট অতীতের এই ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নয়। তাদের সমানাধিকার দেয়া, উদারতার বিষয়, কিন্তু পদ সংরক্ষণ অগ্রাধিকার ও বাঙ্গালীদের উপর প্রাধান্যদান অন্যায় ও বাড়াবাড়ি।

২) (তাং-রোববার ১০ শ্রাবণ ১৪০৬ বাংলা ২৫ জুলাই ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

আগে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ছিলো অনাবাদি পাহাড় ও বনাঞ্চল। বসতি অঞ্চল রূপে সমতল চট্টগ্রামই গণ্য ছিলো। সমতলে জায়গা জমির প্রাচুর্য ও জন সংখ্যার স্বল্পতা হেতু দুর্গম ও বিপজ্জনক পাহাড়াঞ্চলে, বসবাসের প্রয়োজন ছিলো না। হিংস্র জন্তু জানোয়ার ও ম্যালেরিয়ার ভয় ছাড়াও সমাজহীন নির্জনতাও ছিলো এতদাঞ্চলকে এড়িয়ে থাকার কারণ। তবে এই বিরূপ পরিবেশে জুমজীবি বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি ছিলো না। তবে ঐ বহিরাগত জুমিয়াদের অবাধে যাতায়াত ও চাষাবাদ করতে দেয়া হতো না। জুম নোয়াবাদ নামে অস্থায়ী অনুমতি এবং তুলায় বা নগদে জুমিয়া পরিবার প্রতি কর দানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। ঐ কর ও তুলা সংগ্রহের জন্য প্রথমে ইজারাদার নিযুক্ত হতেন। পরে উপজাতীয় সর্দারদের, কিছু পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমে জুমিয়ারা ফসল তোলার শেষে, নিজেদের সীমান্ত পারের মূল বসতি অঞ্চলে, বিশেষতঃ লুসাই ও চীন পাহাড় এলাকায় ফেরত চলে যেতো, এবং পরবর্তী বছরের জুম মওসুমে আবার ফিরে আসতো। এই যাওয়া আসার ভিতর তাদের অনেকে বসতি গড়ে, এতদাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। তবে তাদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য।

বনজ দ্রব্য ও জুম পণ্যের ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে চট্টগ্রামী লোকেরা প্রাচীন কাল থেকেই বনাভ্যন্তরের সাথে সম্পর্কিত। জুমিয়াদের সাথে তারা পণ্য খরিদ বিক্রির কারবারে লিপ্ত ছিলো। এ হেতু সুদুর দেমাগ্রী, শিলছড়ি, কাপ্তাই বাজার, থানচি, বলিপাড়া ইত্যাদি গভীর বনাভ্যন্তরে তারা বাজার বসতি ও উপনিবেশ গড়ে তুলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম বৃটিশ জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের লিখিত বিবরণীতে অবগত হওয়া যায়, কুকি ও লুসাই উৎপাতে প্রত্যন্ত ও গভীর বনাঞ্চলের ঐ চট্টগ্রামী বাঙ্গালীরা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও উপদ্রুত হতো। এর প্রতিক্রিয়ায় সমতলে বাজারগামী উপজাতিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার অশংকা দেখা দিতো। তাতেই মান্য যে সীমিত হলেও প্রাচীনকাল থেকেই নদী তীরবর্তী পাহাড়াঞ্চলে চট্টগ্রামীদের বসবাস ছিলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে উত্তর আরাকানের চীন পর্বতাঞ্চলে স্থানীয় মগ ও চাকমা সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। রাজশক্তির সহায়তা প্রাপ্ত মগদের হাতে চাকমারা ভীষণভাবে পর্য্যুদস্ত হয়, এবং তাতে সর্বপ্রথম তাদের কিছু লোক জনৈক শেরমস্ত খাঁর নেতৃত্বে দেশ ত্যাগ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই শেরমস্ত খাঁ চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুল কদর খানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন, যিনি তাকে দক্ষিণ রাঙ্গুনীয়ার

কোদালা উপত্যকায় ১৭৩৭ সালে একখন্ড অনাবাদি পাহাড়ী জমি বন্দোবস্ত দান করেন, যে জায়গাটি বন্দোবস্তি সূত্রে তরফে শুকদের রায় নামে খ্যাত হয়। তথাকার শুক বিলাস, রাজভিলা ও রাজস্থলী এলাকা তারই অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল। এই প্রথম দলের চাকমা অভিবাসীদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। যাদের বংশধরেরা এখনো ঐ অঞ্চলে আছে। বর্ণিত শেরমস্ত খাঁকে চাকমা লোক গীতিতে নিম্নাকারে স্মরণ করা হয়ে থাকে, যথাঃ

আদি রাজা শেরমস্ত খাঁ
রোয়াং ছিলো বাড়ি।
তারপর শুকদেব রায়
বান্ধে জমিদারী।

নাফ নদীর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রোয়াং বা রোসাং রাজ্যের উত্তরাংশে কালাদন নদী উপত্যকার কথিত মইসাগিরি অঞ্চল ছিলো চাকমা অধ্যুষিত। এটা ছিলো চীন পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল। চাকমা প্রতিপত্তি ও স্বাধীন আচরণে, রোসাং রাজ ও শাসক জাতি মগেরা তাদের আনুগত্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েন। এরই পরিণতিতে একদা ঐ চাকমা অঞ্চল আক্রান্ত ও সেখান থেকে তাদের উৎখাত করা হয়। ঐ উৎখাতকৃত চাকমাদের বৃহদাংশ নিকটবর্তী চট্টগ্রামী দূর্গম পর্বাতঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে ও কিছু লোক প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি হয়। এদেরই এক ক্ষুদ্র পলাতক অংশের নেতা হলেন শেরমস্ত খাঁ। বর্ণিত মঘী আক্রমণ ও বিতাড়নের স্মারক রূপে এখনো গীত হয় নিম্নোক্ত চাকমা গীতিকাটি যথাঃ

'ঘরত গেলে মগে পায়,
ঝারত গেলে বাঘে খায়,
বাঘে ন খেলে মগে পায়
মগে ন পেলে বাঘে খায়।
এলে মৈসাং লালচ নেই,
ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই,
চল ভেই লোগ চল যেই,
চম্পক নগর ফিরি যেই।

এখানে এই গান সূত্রে চাকমাদের আদি পিতৃভূমি রূপে কোন এক চম্পক নগরের কথা জানা যাচ্ছে, যে দেশটির প্রতি তারা চিরকাল অনুরক্ত। কিন্তু সে চম্পক নগরের কোন হদিস নেই।

চাকমা মগ ও আরো আরাকানী ক্ষুদ্র আদিবাসীদের স্বদেশ ত্যাগ ও বাংলা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় কারণ হলো, বার্মায় আভারাজ্য কর্তৃক ১৭৮৪-৮৫ সালে আরাকান আক্রমণ দখল ও স্থানীয় লোকদেল উপর ব্যাপক নির্যাতন অনুষ্ঠান। তখন প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আরকানী উদ্বাস্তুরূপে চট্টগ্রামে সীমান্তের পাহাড় ও বনে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উদ্বাস্ত সমস্যারই শেষ পরিণতি হলো ১৮২৪ সালের প্রথম বৃটিশ বার্মা যুদ্ধ। তাতে আরাকান বিজিত হয়ে ভারতের অন্যতম প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে, এবং তা ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তা-ই থাকে।

চাকমারা বৃটিশ আমলের শুরুকাল পর্যন্ত জাতিগতভাবে ছিলো আরাকানী, আর তাদের প্রধান অংশ তথাকার বাসিন্দা। এর পক্ষে অকাট্য প্রমান হলোঃ জনৈক চাকমা প্রধান শের জব্বার খানের সীলমোহর। তাতে আরবী বর্ণ ও ভাষায় লেখা আছেঃ রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, শের জব্বার খান, ১১১১। মঘী সনের হিসাবে তার সে ক্ষমতারোহনের সময় হলো ১৭৪৯ খ্রীঃ সন। প্রচলিত ইতিহাস হলো তিনি ১৭৬৩ বা ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, যে সালটিতে বাদশা শাহ আলম বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ও নেজামত, ইস্ট ইন্ডিয়া, কোম্পানীর নামে মঞ্জুর করে সনদ প্রদান করেন। সুতরাং এ কথা অকাট্য সত্য যে, চাকমাদের প্রধান অংশ আরাকান ত্যাগ করে বৃটিশ আমলের প্রাথমিক বছরগুলোতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। তারা মূল চট্টগ্রামী বা বাংলাদেশী লোক নয়।

চাকমা রাজা মাননীয় ভূবন মোহন রায়, স্বীয় পুস্তিকা; চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে ও উল্লেখ করেছেনঃ ইতিপূর্বে বার্মায় চাকমাদের একটি রাজ্য ছিলো। মিঃ আর্থার ফেইর ও টি এইচ লুইন ও নিজেদের অনুসন্ধানী বিবরণে বলে গেছেনঃ চাকমাসহ অধিকাংশ স্থানীয় নয়, আরাকানী মূলের লোক।

এখন আরেকটি প্রশ্ন এই যে, চাকমা সর্দারদের মূসলিম নাম খেতাব আরবী বর্ণ, ভাষা ও ইসলামের প্রতি সংশ্লিষ্ট হাওয়ার সূত্র কী? শেরমস্ত খাঁ থেকে ক্রমান্বয়ে দশজন রাজা ও রাণীর এই ইসলামী ঐতিহ্য ধারণ বিস্ময়কর। এছাড়াও গোটা চাকমা সমাজ ভাষা আচার-আচারণে বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির অনুসারী। মুসলিম প্রতিবেশী অন্য কারো মাঝে অনুরূপ সংমিশ্রন নেই। অন্যরা চাকমাদের মত ঈশ্বর বা ভগবানকে খোদা বলেন না। সম্বোধন আর অভিবাদনে ও বলেন না হুজুর ও সালাম ইত্যাদি।

এই সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারটির রহস্যোদঘাটন এখনো গবেষণা সাপেক্ষ। তবে আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানী অভিমত হলোঃ চাকমা সর্দার গোষ্ঠী কোন প্রাচীন মুসলিম অভিজাত বংশোদ্ভুতই হবেন। তারা বৈবাহিক সূত্রে চাকমাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছেন। ঐ সর্দার বংশীয় আত্মীয় কুটুম্বরা হলেন খান দেওয়ান ও খীসা। খীসা শব্দটি ফার্সি, খেশ, বহু বচনে খেসা থেকে অপভ্রংশ। এর অর্থ আত্মীয় কুটুম্ব।

এখন এই সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব যে, চট্টগ্রামীরাই পর্বতাঞ্চলের আদি বাসিন্দা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল। এখানে চট্টগ্রামীদের অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

সম্প্রতি জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান, পুরানবস্তি বাসী চট্টগ্রামীদের প্রতি দরদ ভারাক্রান্ত হয়ে, তাদের সমিতিবদ্ধ তালিকাভূক্তির একটি উদ্দ্যোগ নিয়েছেন। হায়রে চট্টগ্রামী বাঙ্গাল, আর কত ফাঁকিতে নাচবি। মরতে মরতে উজাড়, তবু বৈরীদের প্রতি অন্ধ আস্থা।

চট্টগ্রামীদের মাঝে হাতে গোনা কয়েকজন লোক মাত্র উপজাতীয় গুরুর ভক্ত। এই ভক্তরা সাধারণ চট্টগ্রামীদের বিভ্রান্ত করতে মন্ত্রমুগ্ধের মত কানমন্ত্র ছড়াচ্ছেঃ আমরা পিছনে পড়ে আছি। সন্তু বাবুরা মদদ যোগালে উপকৃত হবো। এতো ব্যাপক দাবী দাওয়া অর্জিত হয়েছে। একদিন স্বাধীন জুম্মল্যান্ড হয়ে যেতেও তো পারে। তারা আমাদের সমর্থন চায়। কেন আমরা শত্রু হবো, সমর্থন দেন! অনেক সাহায্য সহায়তা পাওয়া যাবে। সেটেলার বাঙ্গালীরা চলে গেলে, আমরাই একা বাঙ্গালী কোটা ভোগ করবো। তাতে আমাদের লাভ।

অধিকারের খতিয়ান

মানুষের সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তির মাপকাঠি হলো তার দ্বারা উপভোগ্য মৌলিক অধিকার মানবাধিকার ও মৌলিক চাহিদার বিষয়াদি। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত পুরিপুর্ণ একটি অধ্যায়ই আছে। জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক মানবাধিকার নামীয় তিরিশটি ধারার একটি নীতি ও আদর্শ সুনির্দিষ্ট আছে। মানবিক মৌলিক চাহিদা বলে ও একটি আন্ত র্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনীয় বলে স্বীকৃত। তবু দেশে দেশে এগুলো লঙ্ঘিত হয়, এবংতার প্রতিবাদ ও হয়ে থাকে। এই আইন ও নীতি আদর্শ লঙ্ঘিত হওয়া খুবই দুঃখজনক। আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। এদেশের আমলা মহলের প্রতিও অনুরুপ দোষারোপ করা যায়। গোটা দেশের দরিদ্র জন সাধারণ, বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, আর বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের দুঃখ দুর্দশা আর তাদের প্রতি আচরিত অন্যায় অবিচারের মাত্রা সীমাহীন। এমনটি অনন্ত কাল চলতে পারে না। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। একাজে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে বুদ্ধিজীবি ও সিভিল সমাজকে। তাদের কেউ কেউ অবশ্য বিচ্ছিন্ন ভাবে এ কাজে সোচ্চার আছেন। তবে তাতে অভিযুক্ত রাষ্ট্র সরকার ও আমলা মহলের টনক নড়ছেনা। অতএব দরকার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনের।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো, খাদ্য, বস্ত্র,বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। তার সাথে যুক্ত কর্মসংস্থান ও ভূমি সংস্থান। এ দেশের অর্ধেকের বেশী মানুষ ভূমিহীন ও কর্মহীন। সুতরাং অভাব অসুবিধা তাদের নিত্যসঙ্গী। এই অসঙ্গতিপুর্ণ জীবনে তাই স্বাভাবিক ভাবে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার চাহিদা পুরণ হচ্ছে না। এই অভাব সর্বাধিক প্রকট পার্বত্য চট্টগ্রামে। রাষ্ট্রীয় সঙ্গতি অপর্যাপ্ত হলেও, অর্থ সম্পদ অনুদান ও বিনিয়োগ সর্বোত্তম পন্থায় কাজে লাগান হচ্ছে না। এর অধিকাংশ ব্যয়িত হচ্ছে দুর্নীতি, আত্মসাত উপজাতীয় নেতৃ পোষণ ও তোষণে। বঞ্চিত উপজাতীয় জন সাধারণ অবোধগম্য ভাবে এ ব্যাপারে নীরব। তাতে অনুমান করা যায়, তাদের মাঝে বঞ্চনা সহনীয় পর্যায়ে আছে। নেতৃবৃন্দের পদ ও পারিতোষিকে তারা খুশি। এযেন ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মত, না খেয়ে নাচার পরিতোষ।

উপজাতীয়দের বড় সন্তোষের ব্যাপার হলঃ পার্বত্য চুক্তি আর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুযায়ী একমাত্র উপজাতীয় পক্ষই পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন। আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ, পার্বত্য শরণার্থী বিষয়ক পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান

একমাত্র উপজাতীয় ব্যক্তি হবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়াম্যান পদটি ও তাদের অগ্রাধিকারভূক্ত। প্রথাগত ভাবে তিন সার্কেল প্রধান তো বটেই, তিনশত তেহাত্তরজন মৌজা প্রধান ও শতাধিক বাজার চৌধুরীদের প্রায় সবাই উপজাতীয়। আইন করা হয়েছেঃ পরিষদ সমুহের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন উপজাতীয়। সার্কেল চীফদের সামন্ত ক্ষমতা এতো বাড়ান হয়েছে যে, স্থানীয় স্থায়ী নাগরিকত্ব আর সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের সার্টিফিকেট দানের উপর তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত। তাছাড়া জমি লাভ চাকুরী লাভ ও নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া যাবেনা। চাকুরী ও শিক্ষাবৃত্তিতে ও উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার। তদুপরি যোগ্যতার মাপকাঠিতে ও তাদের জন্য রেয়াত প্রাপ্য। এসব ক্ষেত্রে হতভাগ্য পার্বত্য বাঙ্গালীরা সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত। বাঙ্গালীদের এই বঞ্চনা, সাধারণ উপজাতীয়দের সন্তোষের কারণ। এই কৃত্রিম সন্তোষ তাদের ভাগ্যোন্নয়নের পথে বাধা, এঁটা তাদের বোধগম্য নয়।

স্থানীয় আইনের কোথাও বাঙ্গালীরা স্বনামে বর্নীত নয়। তারা অউপজাতি আখ্যায়িত। তবে উপজাতীয়দের বিপরীত সম্প্রদায় রূপে বাঙ্গালী ছাড়া আরো অনেকে আছে, যেমন- নেপালী, ভুটানী, গারো, আসামী, মনিপুরী, মুরং ইত্যাদি। বাঙ্গালীদের সহ এরা একত্রে সংখ্যাগুরু। এই মানব খিচুড়ীর ভিতর বাঙ্গালীদের তলিয়ে দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র ভাবে বাঙ্গালীদের কোন অধিকার ও স্বীকৃতি নেই। এমন বিস্ময়কর বঞ্চনা ও অবিচার বাঙ্গালীদের পক্ষে সহনীয় নয়। এঁটা বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক আইন অনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এর পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ নং-৭ (২)-এ অনুরূপ আইন প্রনয়ণ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সাংবিধানিক নির্দেশ পালিত হয়নি এবং হচ্ছে না।

পার্বত্য বাঙ্গালীদের প্রায় আটাশ হাজার পরিবার গুচ্ছ গ্রামে আবদ্ধ, জায়গা জমি থেকে বঞ্চিত, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান হারা, এঁটা তাদের প্রতি বিরাট এক অবিচার।

অনুচ্ছেদ নং ১৯-এ সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ সুযোগ দান তো দুরের কথা, তারা কোথাও স্বনামে উল্লেখিত পর্যন্ত হয়না। মানবাধিকার অধিকাংশ স্থানীয় বাঙ্গালীদের বেলায় অবহেলিত। তারা অন্যতম মানবগোষ্ঠী বলে ও স্বীকৃত নয়। স্থানীয় মানবগোষ্ঠীর স্বীকৃতি ছাড়া তারা তো দেনা পাওনার তালিকাভূক্তই হচ্ছে না। নিজেদের রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি বঞ্চনা অবহেলা, অন্যায় ও অবিচার অনুষ্ঠিত হওয়ারই প্রতিফল হলোঃ তাদের প্রতি উপজাতীয়দের মারমুখী হওয়া, ও আমলাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পুর্ন আচরণ।

উদাহরণ রূপে এখানে সাংবিধানিক আইন ও মানবাধিকারের কিছু ধারা সন্নিবেশিত হলো, যা পার্বত্য বাঙ্গালীদের স্বার্থকে সমর্থন করে, যথা ঃ

(১) বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৭ (১) ঃ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ নং-৭ (২) ঃ জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান

প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপুর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

(৩) **অনুচ্ছেদ নং ১৯ (১)** সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(৪) **অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১) ঃ** রাষ্ট্র এই যাহার মৌলিক অধিকার বিধানবলীর সহিত অসমঞ্জস কোন আইন বাস্তবায়ন করিবেন না, অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

(৫) **অনুচ্ছেদ নং ২৭ ঃ** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

(৬) **অনুচ্ছেদ নং ২৮ (১)** কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(৭) **অনুচ্ছেদ নং ২৯ (১)** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(৮) **অনুচ্ছেদ নং ৩৬ ঃ** বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা এবং যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

(৯) **অনুচ্ছেদ নং ৪২ ঃ** প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও বিলি বন্টন ব্যবস্থার অবাধ অধিকার থাকিবে।

সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার ঃ

ধারা-১। বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকারাদি নিয়ে সকল মানুষই জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধি ও বিবেক তাদের অর্পণ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্বসূলভ মনোভাব নিয়ে তাদের একে অন্যের প্রতি আচরণ করা উচিত।

ধারা- ২ ।যে কোন প্রকার পার্থক্য যথাঃ জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকই ঘোষণাপত্রের উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান। অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভূক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না।

ধারা-৩। প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৫। কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা যাবেনা।

ধারা ৬। আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতিলাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭। (ক) আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লজ্ঘনকারী কোনরূপ বৈষম্য বা এই ধরণের বৈষম্যের কোন উস্কাণীর বিরুদ্ধে সমভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা- ১৩। ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খ) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল খুশিমত বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা- ২১। ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারের অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে। গ) জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে, এই ইচ্ছা সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে, গোপন ব্যালট অথবা অনুরুপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরুপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ২৩। ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকুরী নির্বাচনের, কাজের জন্য নায্য ও অনুকুল অবস্থা লাভের এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে। খ) প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। গ) প্রত্যেক কর্মীও তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম এমন ন্যায্য ও অনুকুল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে। ঘ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি আর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে খোলাখুলি ভাবে উপরোক্ত সাংবিধানিক আইন, মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার লজ্ঘিত হয়েছে। যথা ঃ

ক) পার্বত্য চুক্তি দফা নং ক/১ ঃ

"উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষন এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।"

এই বর্ণনাসহ চুক্তি পত্রের সর্বত্র এবং সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে ও বাঙ্গালীদের কোন উল্লেখ ও স্বীকৃতি নেই। অথচ বাস্তবে অউপজাতি আখ্যায়িত বাঙ্গালীরা স্থানীয় জনসংখ্যার বৃহদাংশ রূপে আদম শুমারীতে স্বীকৃত।

খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-২/কক । ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং ২(ক) ঃ

সংজ্ঞা ঃ "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে, বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাস করেন ।"

এই আইনে বাঙ্গালীসহ অন্যান্যদের বলা হয়েছে অউপজাতি । স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালীরা স্থানীয় অধিবাসী বলে স্বীকৃত নয় । অউপজাতিয়রা কোন্ কোন্ সম্প্রদায় ও মানব গোষ্ঠীর সমষ্টি তা এখানে উহ্য । তাদের স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার শর্ত হলো বৈধ জায়গা জমির মালিকানা অথবা সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাস । তাদের বিপরীতে উপজাতীয়দের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে এবং তাদের বেলায় বৈধ জায়গা জমির মালিকানা ও সুনির্দিষ্ট বসবাসের ঠিকানা থাকার শর্ত আরোপিত নেই, যা প্রকাশ্য বৈষম্যে নজির ।

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং ২ (খ) ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং- ২/(গ)ঃ

"উপজাতীয় অর্থ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচৈংগ্যা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু, খেয়াং, ম্রো (মুরং), বোম, খুমি, উসাই ও চাক, উপজাতীয় সদস্য ।

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-৪/(৬), ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং ২/(খ) ঃ

"কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা, এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রাদায়ের সদস্য তাতে সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত পৌর সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীপের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না ।"

এর বিপরীতে উপজাতীয়দের জন্য প্রনীত আইন হলোঃ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-৪/৫ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং ৫/৯ ঃ "কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা সার্কেল চীফ স্থির করিবেন, এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফেকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেননা ।" এখানে সার্টিফিকেট লাভ উপজাতীয়দের চেয়ে অউপজাতীয়দের পক্ষে অনেক দীর্ঘ ও কঠিন প্রক্রিয়া সাপেক্ষ ।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপন যোগ্য যে, সার্কেল চীফেরা সরকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব আসীন কিনা । তারা কার্যত: সামন্ত প্রধান মাত্র । তারা কি স্বাধীন নাগরিকদের পরিচয় দানের সনদ পত্র মঞ্জুরের বৈধ কর্তৃপক্ষ? তারা উপজাতীয়দের দলীয় প্রধান হলেও বাঙ্গালীরা তাদের অধীন প্রজা নন ।

(গ) প্রতিনিধত্ব মূলক পদ লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য যথা ঃ গ) পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীপদ উপজাতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট যথাঃ চুক্তি খন্ড (ঘ) ১৯ ।

উদ্বাস্তু পুর্নবাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদ উপজাতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট, যথাঃ চুক্তি খন্ড (ঘ) ।

চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন যথা আঞ্চলিক পরিষদ

আইন নং ৫(২) ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-৪ ।

জেঃ পঃ আঃ ধারা ৪ (১) (খ) উপজাতীয় সদস্য নির্যাতিত হবেন

(খ) দশ জন অউপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হবেন

(গ) তিন জন মহিলা সদস্য যাহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অউপজাতীয় মহিলা নির্বাচিত হইবেন ।

আঃ পঃ আইন ধারা ৫ (১) (খ) ঃ বারজন উপজাতীয় সদস্য

(গ) ছয়জন অউপজাতীয় সদস্য

(ঘ) তিনজন উপজাতীয় একজন অউপজাতীয় মহিলা সদস্য মনোনীত হইবেন ।

(গ) কর্মসংস্থান ও ভূমি সংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ

পাঃ জেঃ পরিষদ আইন নং ৩১ ও আঃ পঃ আইন নং ২৮ ঃ

সরকারের উপ-সচিব /যুগ্ম সচিব তুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ/ আঞ্চলিক পরিষদের মুখ্য সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় কর্মকর্তাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।

জেঃপঃ আঃ ধারা নং ৩২ (২) ও আঃ পঃ আইন নং ২৯ ঃ

পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে । তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে ।

জেঃ পঃ আঃ ধারা নং ৬২ (আ) জেলা পুলিশ । উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার থাকিবে । জেলাঃ পঃ আইনঃ ৬৪/ যে কোন জায়গা জমি পরিষদের পুর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় বা অন্যবিধ ভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না । জেঃ পঃ আইন ২৪ আঃ পঃ আইন ২৬/ (১ ও ২) অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতাধর উপজাতীয় চেয়ারম্যানদের হাতে বাঙ্গালীদের ভূমি লাভ ও হস্তান্তর আটক হয়ে আছে ।

(ঘ) সরকার নিজ নির্বাহী আদেশের দ্বারা, উপজাতীয়দের জন্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% আসন কোটার প্রবর্তন এবং তাদের জন্য প্রচুর শিক্ষা বৃত্তি আর ফ্রি হোষ্টেলের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন । এর ফলে প্রতি বছর হাজারের কাছাকাছি উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রী বিনা প্রতিযোগীতা ও রেয়াতী যোগ্যতায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে পেশা জগতে প্রবেশ করছে । তাদের র্কমসংস্থানেও সরকার অত্যন্ত উদার । বিপরীতে গরীব বাঙ্গালী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কোন সিট কোটা নেই, কদাচিৎ তারা প্রতিভার বলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় । তাদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি ও বিরল । শিক্ষা জীবন শেষে তাদের জন্য কোন সহজ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও নেই । উপজাতীয় অগ্রাধিকারের ঠেলায় তারা সর্বত্র কোণঠাসা । জাতীয় পর্যায়েও তারা কঠিন প্রতিযোগীতায় আবদ্ধ । সংখ্যায় বেশী না হলেও, স্থানীয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থান বর্জিত হতাশ । এই পরিস্থিতি তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করছে । এসবই চরম বৈষম্য অবিচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘঁটনা ।

পার্বত্য জন সংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবী নামায় স্বায়ত্তশাসন ও বিচ্ছিন্নতা

এটাই ব্যাপক ধারণা যে, পার্বত্য উপজাতিদের পক্ষে জন সংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তি বাহিনী বাড়াবাড়ি করলেও তারা জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ছে। তাদের এই অধিকারের লড়াই, দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিরোধী হলেও তা সরলভাবে মান্য নয়। দেশের অধিকাংশ বামপন্থী পন্ডিত ও কিছু মানব দরদী সরলপ্রাণ বুদ্ধিজীবি, এ ধারণাটির পরিপোষক। এরা যুক্তি ও দরদের মোড়কে, এ ধারণাটির পক্ষে কথা বলেন। কিন্তু দেশে বিদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই, যাদের লক্ষ্য বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিপক্ষে মদদ দান। আমার এ প্রবন্ধটির লক্ষ্য ঃ মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে সুধী ও দেশ প্রেমিকদের ঐ গূঢ় রহস্যটি ওয়াকিবহাল করান যাদ্বারা পরিস্কার হয়ে যাবে যে আসলে পাঁচ দফা দাবী নামায় কী ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচ দফা দাবী নামার চুল চেরা মূল্যায়ন হয়নি। ব্যাপক আলোচনা ছাড়া এর ঘের টোপ উম্মোচিত হবে না। জাতীয় সংকট ও স্বার্থের সাথে জড়িত এ বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার অবকাশ রাখে। অবহেলার কারণে দিনে দিনে এটি জটিল হচ্ছে। উভয় পাক্ষিক বৈঠকের আগে বিষয়টির উপর পাঠ ও অভিজ্ঞতা নেওয়া দরকার। আরো দুঃখজনক বিষয় হলো, দীর্ঘদিন যাবৎ পার্বত্য সংকটটি প্রলম্বিত থাকলেও এখন পর্যন্ত এতদাঞ্চল ও অবাঙ্গালী স্থানীয় বাসিন্দাদের সর্বাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য কোন পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলিত বা রচিত হয়নি। কোন কর্তৃপক্ষই তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। হাঁ ইতিমধ্যে কিছু পুঁথি ও কিংবদন্তি পুস্তক রচিত, সংকলিত ও মুদ্রিত হয়েছে এবং সে সবের উপজাতীয় লেখক গণ অনুদানও পেয়েছেন। তবে ঐ সব লেখালেখিতে বিভ্রান্তি বেড়েছে, প্রকৃত তথ্যের বিশেষ যোগান মেলেনি। এতদাঞ্চল ও তার অধিবাসীদের পরিচয় জানার জন্য দরকার ছিলো তথ্য ভান্ডার গড়ার ও গবেষণার দ্বারা ঐ ভান্ডারটিকে ইতিহাসে রূপ দানের। প্রয়োজন কালে না হলে, এ আর কখন হবে? এটা দুর্ভাগ্যজনক যে অন্ধের হাতি দেখার মত পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিচার হচ্ছে।

উপজাতীয় বিদ্রোহী পক্ষের আলোড়ন সৃষ্টিকারী দাবীগুলো নিয়ে ভাবতে গেলে প্রথমেই এসে যায়, উপজাতীয় ক্ষমতায়নের কথা। প্রথমে এটি ছিলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে দৃঢ়। দীর্ঘ বিশ বছরের রক্ত ক্ষরণের পর ১৯৯২ সালে এটি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম দাবীটি আগেও সাংবিধানিকভাবে আইন সম্মত ছিলো না. সংশোধনের পর এখনো তা সংবিধান সম্মত হয় নি। রাষ্ট্রের এক কেন্দ্রিক কাঠামো তাতে ক্ষুন্ন হয়, এটাই সাংবিধানিক বাধা। এই বাধার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির দাবী হলো ঃ তজ্জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কিন্তু এখানেও পরিস্থিতি বিরূপ। সংবিধান সংশোধনে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজনীয়। এটা মৌলিক সংশোধনী বলেও গণভোটে জাতি কর্তৃক তা গৃহীত হতে হবে। কোন সরকারেরই এটি একক কর্তৃত্বের ব্যাপার নয়। সুতরাং সংশোধনের বিষয়টি সহজ গ্রাহ্য নয়। এই যৌক্তিক পরিবেশে জনসংহতি সমিতির অবস্থান কী

হবে তা অজ্ঞাত। তবে এতে যে তারা ছাড় দিবেন ও শৈথিল্য দেখাবেন, এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ইতিপূর্বে তাদের কাছে পাওয়া যায়নি। অবশ্য বাংলাদেশের পক্ষে অনুরূপ যুক্তি উপস্থাপন করে, তাদেরকে ভাবিয়ে তুলা হয়েছে বলেও কোন খবর নেই। আমাদের জানা মতে, বিদ্রোহী পক্ষের সাথে সরকারি পক্ষের অনেক আলোচনা হলেও, যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক মত বিনিময়ও বিতর্ক খুব কমই হয়েছে, অথবা মোটেও হয়নি। আলোচনার অনুরূপ দৈন্যাবস্থা, সুফল দায়ক হতে পারে না। সমস্যার সমাধান তাই তো সুদুর পরাহত আছে।

মূল প্রধান দাবী হলো, যথাঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া ..... আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা (দাবী-১)। এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে যদি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েও যায়, এবং সরকারও বিরোধী দল সমূহ শান্তিস্থাপনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণও করেন, তবু সংবিধান সংশোধন সহজ সাধ্য নয়। জনসংহতি সমিতির অভিহিত সংশোধন, গোটা সংবিধানকেই প্রভাবিত ও গ্রাস করবে। মনে করা হয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ নং ১ ই মাত্র সংশোধন করা প্রয়োজন, যা বাংলাদেশ নামীয় রাষ্ট্রটিকে এককেন্দ্রিক বা ইউনিটারী ঘোষণা করেছে। অথচ জনসংহতি সমিতির দাবী নং ১ হলো প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনমূলক যার চরিত্র ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এই বিপরীত দুই ধারার রাষ্ট্র কাঠামোতে সঙ্গতি বা সমঝোতা স্বাধন ও দুস্কর। সাংবিধানিক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান ভিত্তিক, সম্ভাব্যতা যাচাই, অথবা সুপ্রীম কোর্টে এর বৈধতা পরীক্ষা কালেও এই সমঝোতার পক্ষে পার পাওয়া কঠিন হবে। বিষয়টি আরো জটিল হবে যখন দেখা যাবে যে, দাবীর অন্যান্য অংশগুলোতে ও সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। শেষ মেষ এই সংশোধনের ধারা, সংবিধান পরিবর্তনেই পর্য্যবসিত হয়। তাতে নিরুপায়ভাবে সবাইকে হতভম্ব আর অক্ষম হয়ে যেতে হবে। অনুরূপ বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই আঁচ করা উচিত।

আমার কথাগুলোকে আগাম হতাশা ও ফেকড়া আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু সুধী মহলের ভাববার বিষয় হলো ঃ রাষ্ট্রের গণপ্রজাতন্ত্রী সাংবিধানিক চরিত্র: কোন রূপ গোষ্ঠীতন্ত্রকে সমর্থন করে না। জনসংহতি সমিতির দাবী হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামেও অখন্ড অঞ্চল ভিত্তিক উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন, এবং বাংলাদেশের সাথে শিথিল সম্পর্ক যে বিষয়টি সরাসরি নয় তির্যক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যথা ঃ

দাবী নং (১/খ) ঃ-

আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

দাবী নং ২(১/খ) ঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া ..... জুম্মল্যান্ড নামে পরিচিতি করা।

দাবী নং ২(খ) ঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রাম/একটি বিশেষ শাসন বিধি অনুযায়ী শাসিত হইবে। সংবিধানের এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(গ) ঃ-

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে, সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(ঘ) ঃ-
পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন, এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা। .....
দাবী নং ২(ঙ-১) ঃ-
গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন যেন না করা হয়, সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।
দাবী নং ২(ঙ-২) ঃ-
আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।
দাবী নং ২(ছ) ঃ-
..... পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।
দাবী নং ২(ঘ) ঃ-
পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসন সমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।
দাবী নং ২(৫-গ) ঃ-
পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
দাবী নং ৩(১) ঃ-
১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা জমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া, অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছ গামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।
দাবী নং ৩(৪-ক) ঃ-
সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনা নিবাস, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া। (সূত্র সংশোধিত দাবী নামা)
এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মাধ্যমে সুধী পাঠক মহলের ধৈর্য্যচুক্তি হলেও এটা তাদের পক্ষে অনুধাবন আর কঠিন নয় যে, সংবিধান বজায় রেখে এবং বাংলাদেশের কর্তৃত্ব বাঁচিয়ে, এই দাবী দাওয়া পূরণ সম্ভব নয়। এটা হলো স্বায়ত্তশাসনের নামে আঞ্চলিক স্বশাসনের ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টা, যার অবস্থান স্বাধীনতা ও বিচ্ছিন্নতার কাছাকাছি। এমনিতে স্বায়ত্তশাসন হলো স্বাধীনতার পূর্ব অবস্থান। এলাকাটিও দুর্গম ও উপজাতি প্রাধান্য ময় সীমান্ত। এই প্রতিকূল পরিবেশ আখন্ডতার রক্ষা করা হয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের

পক্ষে এক নাজুক পরীক্ষা ক্ষেত্র। শুধু উজাতীয় অসন্তোষ দূরিকরণই ভাবনার বিষয় নয়, এবং এ বলাও সঠিক নয় যে, কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা আদায়ই উপজাতীয় সংগ্রামীদের লক্ষ্য। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উপজাতীয় অস্ত্রধারিরা বিদ্রোহী। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাঙ্গালী উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা। ইতোমধ্যে উপজাতীয় লাঞ্ছনা বঞ্চনার বিপক্ষে বহু প্রতিকার হয়েছে। উন্নতি আর অগ্রগতির পরিমাণও যথেষ্ট। এখন বিদ্রোহ অসন্তোষ অব্যাহত থাকার কার্যকারণ নেই। সন্তোষও কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটা উচিত। দেশ রক্ষার কার্যক্রম প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহকে পাহারা দান বা জিইয়ে রাখা নয়, দমন করা এবংতা দ্রুতই হতে হবে। তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ আলোচনার মধ্যমে নিষ্পত্তিকরাই সর্বোত্তম। সরকারী পক্ষে একমাত্র ক্ষমা ও স্থানীয় শাসনই নমনীয়তার বিষয়। অপর পক্ষে শর্তহীন অস্ত্র ত্যাগই হতে হবে সমঝোতার শেষ কথা। এই চূড়ান্ত প্রস্তাবে রাজি না হলে, আর কোন শৈথিল্য নয়। বিদ্রোহীদের দমনও নির্মুলে বাঙ্গালী পুনর্বাসনই মোক্ষম ব্যবস্থা। চিরকালের জন্য বিদ্রোহী পক্ষকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত করার মাঝেই, উপজাতীয় বিদ্রোহ আর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দমনের স্থায়ী ব্যবস্থা নিহিত। এই পথেই সমাধান। সেনা বাহিনীকে শুধু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘরে বাইরে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সন্দেহবাদী লোকেরা সংখ্যায় প্রচুর। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী পক্ষের ক্ষয়ক্ষতিতে ওরা কখনো বিদ্রোহী পক্ষের নিন্দাবাদে সোচ্চার হোন না। ওদেরকে হামেশা বিপক্ষীয় যুক্তি খাটাতেই দেখা যায়। ওরা মাসোহারা ভোগী এজেন্টের মতই ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিছু বামপন্থী দেশীয় পত্রপত্রিকা ও তাদের স্তাবক। কল্পনা চাকমার আজগোবি অপহরণ ও তার জীবন কাহিনী জাতীয় উড়ো কথাই তাদের প্রধান উপজীব্য। দিনকে দিন ইনিয়ে বিনিয়ে তাই প্রচার করতেই তারা অধিক উৎসাহী। না পারতে, দায় সারা গোছের হাল্কা ভাষ্যের বাঙ্গালী হত্যা ও অপহরণের কিছু ঘটনা তাদের প্রচার মাধ্যমে আসে। দেশ ও জাতির সমর্থনে তাদের যুক্তিও আলোচনা কমই পরিচালিত হয়। এ জাতীয় যুক্তি ও আলোচনাকে তারা কমই আমল দেন। এদের মদদেও বিদ্রোহী পক্ষ শক্তি পাচ্ছে।

এতদাঞ্চলের জুম্মল্যান্ড নাম, এর উপজাতীয় অধিবাসীদের জুম্মজাতি পরিচয়, বাঙ্গালী ও সেনা বাহিনী প্রতাহার দাবী এবং বাংলাদেশের সাথে লোক চলাচল ও বসবাসে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রবর্তনসহ পৃথক প্রশাসনিক আইনের সংস্থান দাবীর লক্ষ্য, বাংলাদেশের নিজের দ্বারা স্বেচ্ছায় অঙ্গচ্ছেদ ঘটানও স্বতন্ত্র জুম্মাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা। দাবীতেএতদাঞ্চলে কোন আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় প্রশাসক থাকার প্রস্তাবও নেই। সর্বেসর্বা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবেন আঞ্চলিক পরিষদ প্রধান। এই ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যকে বেনামী বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই বলা যায়। স্বাধীনতার পক্ষে শুধু একটি ঘোষণাই বাকি থাকে যে, বাংলাদেশের সাথে জুম্মল্যান্ডের আর কোন সম্পর্ক থাকলো না। মুক্ত পরিবেশে, উগ্র জঙ্গীবাদী পক্ষ, কোন চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্যোগ নিবে না, এমন নিশ্চয়তা কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। খোদ সরকারই উপজাতিদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পথে এগিয়ে যেতে, স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে, চেয়ারম্যান পদ একক উপজাতীয় কোটাভুক্ত করে উদাহরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। যদিও এ দাবী কখনো সরাসরি উত্থাপিত হয়নি এবং সরকার ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আকারে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসকের কোন আনুষ্ঠানিক প্রাধান্যের ব্যবস্থা রাখেন নি। দূরবর্তী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জেলা

প্রশাসক গণ খন্ডিত কর্তৃত্বেরই অধিকারী ও আমলা। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাদের দায়িত্ব ভুক্ত বিষয় নয়। সুতরাং এবলা বেঠিক হবেনা যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সরকারী নীতি নির্ধারণে তথ্য, তত্ব ও বুদ্ধি কৌশল কমই খাটান হয়েছে।

দাবী দাওয়ার গ্রহণ যোগ্যতা বাড়াবার কৌশল হিসাবে জনসংহতি সমিতি ঘোষণা করেছে যে, তারা সংবিধান গণতন্ত্র ও দেশের অখন্ডতাকে মান্য করে। যথা ঃ এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক ভাবে বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য। স্বীয় জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় পরিচিতি, জন্মভূমি ও ভিটামাটির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে, জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মহান কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়। চায় অতি দ্রুত গতিতে সকল প্রকারের পশ্চাদপদতার অবসান করে, সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে। (সূত্রঃ জরুরী বিবৃতি তাং ২১/১২/৯১ইং)

এই ইতিবাচক বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জনসংহতি সমিতি তৎপ্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ও তার অপতৎপরতা, অস্ত্র বিরতির ঘোষণা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় হয় নি। শান্তি স্থাপনের পক্ষে অস্ত্র ত্যাগই হতো যথার্থ। দেশ ও জাতির বিরূদ্ধে অস্ত্রবাজি বজায় রেখে এবং স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদের মৌলিক অধিকার মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সর্বোপরি দেশের প্রতিরক্ষার অধিকার অস্বীকার করে তাদের এবলা প্রহসন যে, জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী দেশের সংবিধান গণতন্ত্র ও অখন্ডতার অনুসারী। তাই আলোচনার শুরুতে, এই বিবৃতিরই সূত্র ধরে জনসংহতি সমিতিকে, অস্ত্র ত্যাগ, উগ্রতা পরিহার ও অতীত বাড়াবাড়ির জন্য, জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান উচিত। তৎপর জাতীয় ক্ষমা সহানুভূতিও সুযোগ সুবিধা বিবেচ্য হবে। অস্ত্র উচিয়ে রেখে মিঠা কথা অর্থহীন। হয় অস্ত্রত্যাগ, নয়তো বাঙ্গালী আবাসন, এটাই অনমনীয়তার বিপরীতে হতে হবে শেষ কথা।

৯. পার্বত্য চুক্তি, তার মুখবন্ধ ও বাংলাদেশ সংবিধান

পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, যে সময়টি তার খুটিনাটি উদ্ভাবনের পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু লক্ষণে বুঝা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন ও শীর্ষ আমলা মহল সে ব্যাপারে উদাসিন । তারা এই চুক্তি বাস্তবায়নে নতুন করে প্রয়োজনীয় -- বিধি বিধান রচনায় ব্যস্ত, যথাঃ পার্বত্য মন্ত্রণালয় স্মারক নং পাঁচ বিম (গম-১) ৩০/২০০১-৫২৯ তাং ২৬-৬-২০০১ খৃঃ ঢাকা ।

এরশাদ সরকার পার্বত্য সংকট সমাধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন । তখন আওয়ামীলীগ ও বিএনপি তার সমালোচনা করেছে । নব্বই এর দশকে বিএনপি ক্ষমতায় বসে তার কোন রদ বদল বা সংশোধন কিছুই করেনি ।তৎপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে বিদ্রোহী উপজাতীয় সংগঠন পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে একটি সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়, যদ্বারা ভারতে আশ্রিত উপজাতীয়রা স্বদেশে ফিরৎ আসে বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী অস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করে এবং পার্বত্য অঞ্চলে সংগঠিত অরাজকতা স্তিমিত হয়ে আসে, । কিন্তু আংশিক শান্ত এই পরিস্থিতি রচনায় বিএনপি মোটেও সহযোগিতা করেনি, এবং তাতে তার কোন অবদানও নেই । বরং তার চরম একগোয়ে বক্তব্য ছিলোঃ পার্বত্য চুক্তি একটি কালোচুক্তি, এটি প্রত্যাখান যোগ্য, এর দ্বারা দেশের অখন্ডতা ক্ষুণ্ন হবে । পুনরায় নির্বার্চন কালে, সে প্রচার করা সংবিধানের আলোকে এটি সংশোধন করা হবে । কিন্তু সব ভন্ডুল । আওয়ামী চুক্তি হুবহু পালিত হচ্ছে । একটি দাড়ি কমাও বদলাচ্ছে না । এঁটা কি প্রতিভা ও রাজনীতি সংক্রান্ত দেউলিয়াত্ব নয় ?

এঁকথা শত্রুকেও স্বীকার করতে হবে যে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাঙ্গালী বসতি স্থাপনই পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং এঁটিই বিএনপির পার্বত্য রাজনীতির একমাত্র পূঁজি । বেগম জিয়ার দুটি শাসন আমল হলো পূর্ববর্তী দুই সরকারের পদাঙ্ক অনুসরন । বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য নীতিতে তার কোন অবদান নেই । কেবল সমালোচনা ও কঁটুক্তির তো কোন মানে হয় না । এঁটা স্বীকার করতে হবে যে নমনীয় পার্বত্য চুক্তির দ্বারা আওয়ামী লীগ ও তার সরকার পার্বত্য জনসংহতি সমিতিকে এক প্রচন্ড মার দিয়েছে । সে মারটি হলো পার্বত্য চুক্তির মুখবন্ধ । হাল্কা ভাবে না পড়ে এটিকে তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবেঃ জনসংহতি সমিতি তার দাবী দাওয়ার সবই হারিয়েছে, কিছুই অর্জন করতে পারেনি । দেশের অখন্ডতা ও সংবিধানের প্রতি সে আনুগত্য

দেখিয়েছে, এবং চুক্তির অনুসরণীয় মূলনীতি হলো তাই। চুক্তির বাদ বাকি অংশ এই মূলনীতির সাথে সঙ্গতিশীল নয়। তাতে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অখন্ডতা এবং সংবিধান লজ্ঘিত হয়েছে, যা করার অধিকার কারো নেই। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক নির্দেশ হলোঃ

বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ নং ৭(১)ঃ প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ, এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জসপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১) এই ভাগের (তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার) বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন, যতখানি অসামঞ্জসপূর্ন এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে, সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রনয়ন করিবেন না, এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ন, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

এই চূড়ান্ত সংবিধানিক নীতি নির্দেশ অনুসারে পার্বত্য চুক্তি ও তার আওতায় প্রণীত আর প্রণীতব্য আইন ও বিধি বিধান অবশ্যই মূল্যায়ন যোগ্য। তাতে চুক্তির অন্তর্ভূক্ত যে সব দফা বিধি বিধান ও আইনে সংবিধানিক অসামঞ্জস্যতা পওয়া যাবে, তা প্রয়োগ যোগ্য হবে না। এমন কি তা বাতিল পর্যন্ত হবে। এমন চুক্তি সম্পাদন ও আইন বিধি প্রণয়ন ও নিষিদ্ধ। পার্বত্য চুক্তি দলিলটির একমাত্র মুখবন্ধটি এই নিষেধাজ্ঞায় পড়ে না। চুক্তির দফাওয়ারী বাকি অংশের পুরোটাই সংবিধান বিরুদ্ধ। এই সংবিধান বিরোধীতাকে অবজ্ঞা করে বিধি বিধান প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ, সাংবিধানিক অপরাধ। ২৬(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা, পূর্ববর্তী আওয়ামী সরকার তো অবজ্ঞা করেছেনই, বর্তমান জোট সরকারও তার অনুসরণ করছেন। অথচ তলিয়ে দেখার অবকাশ আছে যে, বিদ্রোহ বিধ্বস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে চুক্তিটি যেমন প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে, তেমনি অসাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা দূরিকরণেও এটি কার্য্যকর। মুখবন্ধই চুক্তির অঙ্গীকার ও মূলনীতি। সে অনুসারে গৃহীত অঙ্গীকার ও মূলনীতি রক্ষায় চুক্তিকারী উভয় পক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য।

ভূমি ও মানুষের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত। রাষ্ট্রের চৌহদ্দিভূক্ত বৈধ বাসিন্দাদের নিয়েই গঠিত জাতি। এই দৃষ্টিতে রাষ্টীয় অখন্ডতার ভিতর জাতীয় অখন্ডতাও নিহিত। উপজাতীয় জনসংহতি সমিতি রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষায় চুক্তিবদ্ধ। এটি জাতীয় অখন্ডতা রক্ষার চুক্তিও বটে। এমতাবস্থায় চুক্তিভূক্ত দফাগুলোকে অখন্ড জাতীয় স্বার্থ ভিত্তিক হতে হবে। এজন্য মুখবন্ধে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও উন্নয়নের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর বিপরীতে চুক্তির দফাওয়ারী বিবরণে কেবল উপজাতীয় কল্যাণ, অগ্রাধিকার ও

পদ সংরক্ষন এবং বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের বঞ্চনার বিধি ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্তি অবাঞ্ছিত, যা চুক্তির মূলনীতি অঙ্গীকার ও সংবিধান অনুমোদন করে না। এই সীমা লঙ্ঘন অবশ্যই প্রয়োগযোগ্য নয়। মুখবন্ধের অঙ্গীকার অনুসারে উভয় পক্ষ এই ক্রটিগুলো সংশোধনে বাধ্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারেঃ চুক্তি কালে উভয় পক্ষ এই ক্রটি গুলোর প্রতি সায় দিয়েছেন এবং এখন তা চুক্তির অংশে পরিণত। পরবর্তীদের জন্য এখন এগুলো পালনীয় বাধ্য বাধকতা। এর ব্যতিক্রম করা হবে অসন্তোষজনক ও উত্তেজনাকর। নতুন করে এটি অশান্তি সৃষ্টির কারণ হতে পারে, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

এটি এক নিরিহ বক্তব্য। আওয়ামী সরকার, এ ক্রটিগুলো জেনে শুনে করেছেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিলঃ আগে শান্তি অর্জন। তাই কুটকৌশল পূর্ণ অঙ্গীকার ও মূলনীতিটা, মুখবন্ধে স্থাপন করে, প্রতিপক্ষকে সব দেওয়ার ঝুকি নিয়েছেন, যে মুখ বন্ধ একদিন প্রতিপক্ষের সব পাওয়ার ব্যবস্থাগুলো বানচাল করে দেবে। শুধু দরকার হবে একটি রীট মামলার। যে কোন বিক্ষুব্ধ পক্ষ তা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করলেই, মুখবন্ধের পক্ষে রায়টি হবে, তা নিশ্চিত।

চুক্তির দ্বারা আওয়ামী পক্ষের রাজনৈতিক অর্জন ও সাফল্য হলোঃ

ক) ভারতে আশ্রিত উপজাতীয় শরণার্থীরা ফিরৎ এসেছে।

খ) সশস্ত্র শান্তি বাহিনী অস্ত্র গোলাবারুদ সহ আত্মসমর্পন করেছে।

গ) বিদ্রোহী উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এখন নিয়ন্ত্রণাধীন ও পূনর্বাসিত।

এখন অবশিষ্ট যা করণীয় তা ক্ষমতাসীন সরকারকেই করতে হবে, এবং তা হলোঃ

ক) চলমান উপজাতীয় সন্ত্রাস দূর করা।

খ) সংবিধান ও মুখবন্ধের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পার্বত্য চুক্তি সংশোধন ও তার পক্ষে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা।

গ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি, বৈষম্য বিলোপ ও প্রতিযোগিতা মূলক গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও পদায়নের ব্যবস্থা করা।

ঘ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ভূমি মালিকানা, গৃহায়ন ও পেশা প্রশিক্ষণের বৈষম্যহীন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

ঙ) জরিপের দ্বারা সর্বাধিক পশ্চাদপদ লোক ও সম্প্রদায় নির্ণয় ও তাদের উন্নয়নে মেয়াদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

উল্লেখ্য যে চুক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে জনসংহতি সমিতিকে যে ছাড় দেয়া হয়েছে, তা চুক্তির মুখবন্ধই সমর্থন করে না। এবং তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এর সরাসরি লঙ্ঘনও বটে। চুক্তির অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এ ক্রটি সংশোধনে নীতিগত বাধ্য। তাদের কাছে ক্রটি গুলো তুলে ধরা দরকার। নতুন

বিদ্রোহের ভয় ও তোষামোদ যথার্থ কাজ নয়। সরকারকে সাহসী ভূমিকা নিতে হবে।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের পূনর্বাসন ব্যবস্থা হলো আঞ্চলিক পরিষদ গঠন। আসলে এই পরিষদের কোন সাংবিধানিক সংস্থান নেই। দেশ সাংবিধানিক ভাবে এককেন্দ্রিক। কতিপয় প্রশাসনিক ইউনিটে মাত্র এটি বিভক্ত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫৯ প্রত্যেক প্রশাসনিক ইউনিটে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা অনুমোদন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ ও ৫৯ এই উভয় আইনের কোনটিতেই সংস্থান যোগ্য নয়। তবুও এটিকে আইন সঙ্গত করার কোন প্রচেষ্টা নেই। এঁটা সরকারের ত্রুটি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ডিভিশনে উন্নীতি করা গেলেই এ ত্রুটির সংশোধন হয়ে যায়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ অথবা ৫৯-এ প্রয়োজনীয় সংযোজন বা সংশোধনী এনেও সংস্থান ব্যবস্থা করা সম্ভব, অথবা দেশটাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পূণর্গঠন করা হলেও, এরূপ আঞ্চলিক পরিষদের সংস্থান হতে পারে। এরূপ গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মালিক সরকার হলেও রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা সম্পন্ন লোকই যেন সরকারে নেই। কায়েমী পদাধিকারের রাজনীতির বলেই প্রতিভার কদর অবহেলিত।

পার্বত্য চুক্তির প্রশংসিত মুখবন্ধটি এখানে উল্লেখ্য, যথা ঃ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে প্রার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, নিম্নেবর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

চুক্তিটি সরকারী কিনা, এ প্রশ্নটি বাদ দিয়েও বলা যায়।, এর মুখবন্ধটি হলো মৌলিক বাধ্যবাধকতা। চুক্তির দফাওয়ারী বক্তব্য এর ব্যতিক্রম হলে, খোদ এ মুখবন্ধ বলেই তা বাতিল যোগ্য। তজ্জন্য পৃথক বাতিল আদেশ জারির প্রয়োজন নেই। প্রতিপক্ষকে তা জানিয়ে দেয়াই হবে যথেষ্ট এবং এ বলে দেয়াও আবশ্যক যে, চুক্তিভূক্ত এই এই দফা, মুখবন্ধ ও সংবিধান বিরোধী। সুতরাং এ বিতর্কিত বিষয় সমূহ বাস্তবায়ন আইন সঙ্গত নয়।

সাংবিধানিক আইন হলোঃ

ক) অনুচ্ছেদ নং ১৯ (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

খ) অনুচ্ছেদ নং ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

গ) অনুচ্ছেদ নং্ ২৯ (১)। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল

নাগরিকের জন্য সুযোগের ক্ষমতা থাকিবে।

এই আইন চতুষ্টয় অমান্য করে, পার্বত্য চুক্তিতেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে, মন্ত্রী পদ ও চেয়ারম্যান পদ উপজাতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। কর্মসংস্থান ভূমি বন্দোবস্তি সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। এই বৈষম্য সমূহ একাধারে অগণতান্ত্রিক, অমানবিক আর অসাংবিধানিক। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪) নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়নের বাধাহীন অনুমোদন দিলেও তা কেবল উন্নয়ন ভিত্তিক। মৌলিক অধিকার মূলক আইন তদ্বারা লঙঘনীয় নয়। এই সাংবিধানিক ত্রুটিগুলো সংশোধিত না হলে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির রীট মামলার দ্বারা, অথবা খোদ সুপ্রিম কোর্টের সুয়োমটো ক্ষমতা বলে, বর্ণিত আপত্তিকর চুক্তি ও আইন গুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, এই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ও প্রভাবে অনির্দিষ্ট কাল অনুরূপ রীট ও সুয়োমটো মামলা ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হবে। তার আগে অনগ্রসরদের আইন সঙ্গত উন্নয়ন ব্যবস্থার বিনিময়ে সাংবিধানিক আপত্তিগুলোর মীমাংসা হয়ে যাওয়া উচিত। চুক্তির মুখবন্ধই তার পথ প্রদর্শক। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ঐকমত্য তাতে আছে।

স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দার সনদ দান, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এটি সামন্ত প্রধান, তিন উপজাতীয় রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন করা মানে গণপ্রজাতন্ত্রীকতা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। অনুচ্ছেদ নং ১ এমন কার্যক্রমের পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ নং ১২২ নাগরিকদের ভোটাধিকার সুনির্দিষ্ট করেছে। কিন্তু চুক্তি ও জেলা পরিষদ আইনে তা শর্তাধীন করা হয়েছে, যা সংবিধানের গহীঁত সীমা লঙ্ঘন। চুক্তি ও আইনের কতিপয় ধারায়, সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদাকে ক্ষুণ করে বলা হয়েছেঃ "অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন" এই বক্তব্য সংবিধানের পক্ষে চূড়ান্ত অবমাননাকর। এঁটা অনুচ্ছেদ নং ৭ (২) এর সরাসরি লঙ্ঘন। অবাধ চলাচল পেশা ব্যবসা, বাণিজ্য ও ভূমি মালিকানা সংবিধানের ৩৬ ও ৪২ ধারায় নিশ্চিত করা হয়েছে। যা চুক্তিতে মান্য হয়নি এটা ও সংবিধান লঙ্ঘন।

সন্তু বাবুদের রাজনৈতিক লক্ষ্য আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ

কথায় বলে ঃ কারো পৌষ মাস, আর কারো সর্বনাশ। সন্তু বাবুরা বাংলাদেশের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনায়আনতে মোটেও রাজি নন। তাদেররাজনৈতিক লক্ষ্য আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ। এর চেয়ে কম কিছুতে তারা সন্তুষ্ট নন। বর্তমানে পার্বত্য চুক্তির আওতায় উপজাতীয় পক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় পরিচালনা, তিন পার্বত্য জেলায় সমন্বিত আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও তাদের প্রাধান্যাধীন। এটাকে তারা যথেষ্ট বলে ভাবছেন না। তাদের আরো অধিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চাই, যে ক্ষমতা সার্বিক প্রশাসনিক। তারা সরাসরি স্বাধীনতার দাবি করছেন না বটে। তবে স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হলো স্বাধীনতারই পূর্ববর্তীধাপ,যা একটি ঘোষণার বিষয় যা স্থানীয় জনসমর্থন ও আন্তর্জাতিক অনুমোদনে সহজেই অর্জিত হতে পারে। সামরিক দমনপীড়ন তখন কোন কাজে আসবে না। এর উদাহরণ হলো বসনিয়া ও পূর্ব তিমুর। বালাদেশ নিজ ভূমে এমন পরিস্থিতির শিকার হতে পারে না। এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি ঠেকানো বাংলাদেশের বাঁচা মরার বিষয়।

বাংলাদেশ তার সাধ্যমত উপজাতীয় কল্যাণ ও তোষণে লিপ্ত। আইন ও স্বাধীনতার পরিপন্থী হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সামান্ত ব্যবস্থা, তথা তিন উপজাতীয় সার্কেল, তিন শত তেহাত্তর মৌজা, ও শতাধিক বাজার শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং বিস্ময়কর হলো, ভূমি রাজস্বের ১০-১২% এবং জুম করেন ৮৫% উপজাতীয় রাজা ও হেডম্যানেরা আগাম ভোগ করে থাকেন। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় বনভূমির ৩১৬৬.৪০ বর্গমাইল এলাকা উপজাতীয় লোকদের অবাধ জনভূমিতে পরিণত হয়ে আছে, যে জন্য তারা প্রশাসনিক অনুমতিরও ধার তারা ধারেন না। অথচ প্রচলিত পার্বত্য শাসনবিধির ধারা নং-৪১ ও ৪১(ক) উপজাতীয়দের কোনরূপ অবাধ জুম চাষের অধিকার দেয় না। এই বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় বনভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ রাজি যেমন বাঁশ গাছ লতাপাতা, পশু-পাখী, খনিজ পদার্থ, ভূমি ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ হলেও তা উপজাতীয়রা বেআইনিভাবে ধ্বংস, আহরণ, খরিদ, বিক্রি, ব্যবহার ইত্যাদি কাজেও অবাধে তৎপর। অথচ প্রচলিত পার্বত্য শাসন ও বিধি ধার নং-৫০ তাদের শহর বহির্ভূত অঞ্চলে

বাসা বাড়ীর প্রয়োজন মিটাতে বিনা বন্দোবস্তিতে মাত্র তিরিশ শতক জায়গা ভোগ দখলের অধিকার দিয়েছে,তাও ঐ দখলকারীকে কেবল উপজাতীয় হলে হবে না, তাকে পাহাড়ী সংজ্ঞাভুক্ত লোক হতে হবে; যার অর্থ আদিম ও স্থানীয় পাহাড়বাসী লোক হওয়া। এই সংজ্ঞাভুক্ত স্থানীয় উপজাতীয় লোক এখানে বিরল। মারমারা নামেই বর্মী,মগ ও রাখাইনরা আরাকানী, ত্রিপুরারা ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী, লুসাই ও মিজোরা মিজোরামবাসী, চাকমারা ও মগ বিতাড়িত আরাকানী। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও বহিরাঞ্চলের লোক। এদের সবাই এদেশে অভিবাসী বংশধর। এরা এদেশের স্থানীয় আদিবাসিন্দা পাহাড়ী নয়। তাদের স্থানীয় আদিমতা ও সন্দেহজনক। এতসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র তাদের প্রতি উদার। তাদের ভূমিদখল ও সম্পদ ধ্বংস করা কে অপরাধরূপে আমলে আনা হয় না। তদুপরি তাদের শান্ত ও সন্তুষ্ট করতে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীপদ, আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদ, তিনসার্কেল চীফ ও বহুবিধ মৌজা হেডম্যান পদ ইত্যাদিতে সমাসীন করে রাখা হয়েছে। জন প্রতিনিধিত্বমূলক এমপি পদ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদ এমন কি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্র প্রধান পদের জন্য পর্যন্ত তারা যোগ্য। অধিকাংশ স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে এবং তিনজেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য পদেও তারা বরিত। উচ্চ শিক্ষা আর কর্মসংস্থানেও তারা অগ্রগণ। তারা শিক্ষা-দিক্ষা, কর্মসংস্থান, আর আয়-রোজগারেও পিছিয়ে নেই।এখন তারা বঞ্চিত পশ্চাৎপদ আদিম 'আদিবাসী' লোক নয়। বাংলাদেশের গত তিরিশ বছরের ভিতর তাদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তাদের তুলনায় এখন বাঙ্গালীরা বৃহদাংশে পশ্চাৎপদ জাতি। বাংলাদেশস্বীয় সাধ্যাতীত প্রয়াসে উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করেও উপজাতীয় সন্তুষ্টি বিধানে অক্ষম। তারা বাংলাদেশকে অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও উপজাতি বৈরী আখ্যায়িত করে শাসন প্রশাসনকে উপজাতীয় করণের দাবি তুলছে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভকেই রাজনৈতিক লক্ষ্য করে আন্দোলনে উত্তপ্ত। এটা বিচ্ছিন্নতার পূর্বাভাস। এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি নমনীয় হলে উপজাতীয়রা বাংলাদেশকে জিন্দাবাদ জানাবে এবং অস্ত্রত্যাগ করে শান্ত সুবোধ হয়ে উঠবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং তাতে এই অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পথ সুগম হবে, সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। এই আশঙ্কাকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশকে এই অঞ্চলভিত্তিক নীতি নির্ধারণে মনোযোগী হতে হবে।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে আমাদের রাজনীতি অঙ্গনে চিন্তা-চেতনার দৈন্য চলছে বলেই মনে হয়। উপজাতীয় রাজনীতির সফল বিকল্প উদ্ভাবনে আমরা অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছি, যার পরিণতি সুখকর ভাবার অবকাশ নেই। উপজাতীয়দের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের বিষয় এবং দাতা রাষ্ট্রসমূহের অসন্তোষকে আমরা মাত্রাতিরিক্ত ভয় করি। এ কারণে বাঞ্ছিত নীতি নির্ধারণ থেকে আমাদের জাতি ও সরকার পিছপা। এ কাজটি আমাদের কাছে অপ্রিয়। আসলে আমরা জানি উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী এবং তা দমনের কৌশলও আমাদের

করায়ত্ত। উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি হলোঃ তারা চট্টগ্রাম মূলের স্থানীয় অধিবাসী নয়, বহিরাগত অভিবাসী বংশধর। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবি অযৌক্তিক। এতদসত্ত্বেও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবি দুর্দমনীয়,আর বহিরবিশ্ব কর্তৃক সমর্থিত হয়ে উঠলে আমাদের নিরুপায় করণীয় হবে, বাঙ্গালী লোক বন্যায় এতদঞ্চলকে ভাসিয়ে দেয়া, অথবা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সাথে কিছু সীমান্ত অঞ্চলের যোগ-বিয়োগ সাধন, যাতে স্থানীয়ভাবে বাঙ্গালী সংখ্যা প্রাধান্য রচিত হয়। যখন সাধ্যাতীত কল্যাণ ও তোষণের মাধ্যমেও উপজাতীয় সন্তুষ্টি বিধান সম্ভব হচ্ছে না, তখন রাষ্ট্রের অখন্ডতাকে নিরাপদ করতে কঠোর হওয়া ছাড়া উপায় কী। বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস যতই অপ্রিয় হোক, অখন্ডতা রক্ষায় বাংলাদেশকে তা করতেই হবে। উপজাতীয়দের পূর্বাহ্নে এভাবে সতর্ক করে দেয়া আবশ্যক, রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের আওতায় তাদেরকে গণতন্ত্র ও সমঅধিকারের প্রতি অনুগত হয়ে সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি ত্যাগ করতে হবে। এভাবে শান্তি ও সুবোধ নাগরিকের পরিচয় দিয়ে বাঙ্গালীদের প্রতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখালে, 'বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা পরিহার করা যাবে। নতুবা তা অবশ্যম্ভাবী।

উপজাতীয় বিদ্রোহেরই ফসল বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। হত্যা ও সন্ত্রাস তার বিকল্প নয়। পার্বত্য চুক্তিকে বিদ্রোহের ফসল ভাবা যথার্থ নয়, এটা রাষ্ট্রীয় উদারতারই ফল। উপজাতীয়রা রাষ্ট্রের পক্ষে বৈরী না অনুগত নাগরিক, তা প্রমাণের দায়িত্ব তাদের নিজেদের। বাঙ্গালীরা পর্বতাঞ্চলে ব্যাপক হত্যার শিকার হওয়া কালেও দেশের কোথাও কোন উপজাতীয় লোক প্রতিহিংসার শিকার হয়নি। এটাই প্রমাণ উপজাতীয়দরে প্রতি দেশ ও জাতি যথেষ্ট সহনশীল ও উদার। এই অনুকূল পরিস্থিতি উপজাতীয়দের কল্যাণ ও উন্নতির সহায়ক। বিপরীতে উগ্র রাজনীতি ক্ষতিকর।

প্রায়ই সন্তু বাবুদের কিছু আপত্তির কথা শোনা যায় ও পত্র পত্রিকায় আসে। তবে তার অনেকটাই স্ববিরোধী ও অযৌক্তিক। স্থানীয় রাজনীতি চর্চায় তাদের যে প্রচুর ভুল ত্রুটি হচ্ছে এবং অনেক রাজনৈতিক ফাঁক ও ফাঁকি যে তাদের জড়িয়ে আছে, তা বিবেচনায় আনতে হবে। তৃতীয় আদিবাসী বর্ষ পালন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় সন্তু বাবু অভিযোগ করেছেনঃ

ক) সরকার পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ী জনগণের সাথে প্রতারণা করেছেন। পার্বত্য চুক্তি আজ কাগুজে চুক্তিতে পরিণত।

খ) পাহাড়ীদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গ) চুক্তি অনুযায়ী সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

ঘ) ক্ষমতাসীন দল পাহাড়ীদের অধিকার পদদলিত করে তাদের বিলুপ্ত করার চেষ্টা করছে।

ঙ) পাহাড়ীদের উপর বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে ।

চ) সেনা শাসনে জুম্ম জীবনও সংস্কৃতি বাধাগ্রস্ত ।

এই অভিযোগগুলোর সাথে যুক্ত হবে ইতিপূর্বে উচ্চারিত অভিযোগ সমূহ যথাঃ আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু পূনর্বাসনের নামে সরকার বাঙ্গালী পূনর্বাসনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন ইত্যাদি । সাদামাটা হিসাবে মনে হয় অভিযোগগুলোর একটিও মিথ্যা নয় । তবে সন্তু বাবুরাও যে ধোয়া তুলসি পাতা নন, সরকারের সাথে একই দোষের অংশীদার এবং আরেক নবতর বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রকারী, তা তাদের কার্যকলাপেই বোঝা যায় । ঐ লক্ষ্যেই তো তিনি হুমকি দিয়েছেনঃ

আমাদের ফেলে আসা কর্মসূচীকে কার্যকর করতে হয়তো বা নতুন করে ভাবতে হতে পারে ।

ফেলে আসা কর্মসূচী মানে তো সশস্ত্র বিদ্রোহ, এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না । তবে হুবুর সন্তু বাবুরা, এতো ধৈর্য্যহারা হবেন না । শেষে আম যাবে, ছালাও যাবে ।

কেবল সরকারকে দোষ দেন কেন, নিজেদের দোষ ও দেখেন ? প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা আর ফাঁকি দেয়া তো কুটনীতির চিরাচরিত ধর্ম । আপনারা পরাজিত হয়েছেন ও ফাঁকিতে পড়েছেন, এবং চুক্তিটিও কাগুজে এ কথাগুলো বলা আপনাদেরই পক্ষে অপমানজনক । তাতে আপনাদের রাজনৈতিক অদক্ষতা আর অদুরদর্শীতাই প্রমাণিত হয় । আপনারা জেনে শুনেই একটি শূন্যকে নিয়ে চুক্তি করেছেন । পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে কোন প্রশাসনিক অঞ্চল নয় । এই শূন্যকে অবলম্বন করে, কোন বিভাগ বা জেলা গঠিত নেই । আপনাদের দাবী অনুযায়ী সরকার এই শূন্যকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু করে, উপজাতীয় অগ্রাধিকারমূলক চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন । তাতে সরকারের দোষ কোথায়? এটা আপনাদের নিজেদের সৃষ্ট ফাঁকি । এই ফাঁকির কারণে আঞ্চলিক পরিষদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । আওয়ামী সরকার বা ভিন্ন দলীয় কোন সরকার এই ফাঁককে অবলম্বন করে পার্বত্য চুক্তি, তৎ ভিত্তিক আইন, আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য মন্ত্রনালয়কে হেস্তনেস্ত করে দিতে পারে । তজ্জন্য প্রয়োজনঃ কেবল উভয় পাক্ষিক বিরূপতা । সুতরাং সন্তু বাবুরা, ক্ষমতাসিনদের ক্ষেপাবেন না । শান্ত থাকুন ও হুবুর করুন । তাতে গাড়ি, বাড়ি, বেতন ভাতা পদ ও মর্যাদা রক্ষা পাবে । ক্ষমতা শূন্যতার প্রশ্নটি চাপা পড়ে থাকবে । সাথে সাথে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ও থাকবে অক্ষুন্ন । পাহাড়ের নেৎটি বাঙ্গালীরা নির্বিরোধ থাকতেই আগ্রহী । নেহাত বাধ্য না হলে তারা কোন ঝামেলায় যায় না । একটু দরদ দেখালেই সম্বর্ধনা পাবেন । বলবে ঃ "সন্তু লারমা জিন্দাবাদ"

দ্বিতীয় আপত্তিটি এক পাক্ষিক ও অবাস্তব । বাস্তবতা হলোঃ বাংলাদেশ একটি সাহায্য নির্ভর গরীব দেশ । তদুপরি এর হর্তাকর্তারা ব্যাপকভাবে দূর্নীতিগ্রস্ত । এখানে সৎ নেতৃত্ব আর আলাদীনের প্রদীপ নেই । সুতরাং ধুকে ধুকে আর ধীরে ধীরেই এদেশের ভাগ্যের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক । আপনি হোন আর যে-ই হোন, দারিদ্র্য সবাইকে ঠেকিয়ে রাখবে । কেবল পার্বত্য অঞ্চল আর পাহাড়ী অবাঙ্গালীদের এক পাক্ষিক সমস্যা এটি নয় ।

গোটা জাতি আজ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতায় আবদ্ধ। এ জাতির সর্বাধিক দুর্ভাগ্য হলোঃ প্রতিভাশালী নেতৃত্বের অভাব। এই শূন্যতাকে পুরণ করে আছেন দুই গৃহবধু, যাদের বুঝতে ও বুঝাতে উপদেষ্টা ও দোভাসী লাগে। এ দেশ উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানে পশ্চাদপদ। রাজনীতি নয়, টাকা, তোষামোদই এদেশে নীতি আদর্শের ভিত্তি। তার সাথে সোনায় সোহাগা হলো মাস্তানী আর কাড়াকাড়ি। আপনিও শক্তিমত্তার গুণে আঞ্চলিক নেতা। নীতি আদর্শের গুণে নয়। আপনি জনসমর্থন পুষ্ট জননেতার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিতে উর্ত্তীণ হয়ে আসুন। এটাই রাজনীতির চাহিদা। নতুবা আপনার এ কথা গুলো হবে নেহাত চমক লাগানো রাজনৈতিক বুলি।

তৃতীয় প্রশ্নটি সর্বাংশে সঠিক নয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যাবাসন ও অস্ত্র ত্যাগের জন্য সংশ্লিষ্টরা বিপুল অর্থকড়ি পেয়েছেন। আইন ও প্রণীত হয়েছে। তদনুযায়ী গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, পার্বত্য মন্ত্রণালয়, ভূমি কমিশন, আভ্যন্তরিক উদ্বাস্তু পূর্ণবাসন সংস্থা টাস্কফোর্স ইত্যাদি। এসব কি কম সাফল্য?

চুক্তি অনুযায়ী আরো অনেক কিছু কার্যকর করা অবশ্যই বাকি আছে। কিন্তু ভাবতে হবে অনেক কিছুর বিপরীতে শক্তিশালী জাতীয় বিরোধিতাও আছে। নাক কান বন্ধ করে একরোখাভাবে রাতারাতি সব কিছু করা যায় না। তবু তার জন্য জেদ ধরা, বাড়াবাড়ির শামিল।

চতুর্থ অভিযোগটি সম্পূর্ণ ফাঁকা বুলি, বরং আওয়ামী সরকার জাতীয়ভাবে এ অভিযোগে অভিযুক্ত যে, তারা পাহাড়ীদের প্রতি নতজানু। শরনার্থী পত্যাবাসনের ছত্রছায়ায়, এতদাঞ্চলে অনেক অস্থানীয় পাহাড়ীর আগমন ঘটেছে। এবং আওয়ামী সরকার উপজাতীয়দের স্বার্থে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালী হটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তো সন্তু বাবুরা দাবী করেনঃ সরকারের সাথে তাদের এ ব্যাপারে অলিখিত চুক্তি হয়েছে।

পঞ্চম অভিযোগটি ধোপে টিকেনা। খোদ সন্তু বাবু মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে আদিবাসি সম্মিলন উদ্বোধন করেছেন যা পাহাড়ী নয় হিন্দু সংস্কৃতি। এভাবে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন। যে জন্য অপর কাউকে দোষ দেয়া যায় না।

শেষ অভিযোগটি রাজনৈতিক চমক সৃষ্টির হাতিয়ার। সেনা বাহিনীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেশ ভিত্তিক সার্বিক। এই পার্বত্য অঞ্চল বিদ্রোহ পর্যুদস্ত। এখানকার প্রতিরক্ষা ও আইন শৃংখলার ব্যাপারটি অভ্যস্ত জটিল। আনসার ও পুলিশের দক্ষতা ও শক্তি এই বিদ্রোহ প্রবণ দুর্গম অঞ্চলে আইন শৃংখলা রক্ষার পক্ষে উপযোগী নয়। তদুপরি এতদাঞ্চলে নতুনভাবে দেশী বিদেশী জিম্মি করণ, বিদেশী বিদ্রোহীদের আনাগোনা ও উপদ্রব ক্রিয়াশীল। খোদ সন্তু বাবুর সমর্থক একদল সশস্ত্র কেডার ও তাদের বিপক্ষ আরেক দল স্বায়ত্তশাসন পন্থী সশস্ত্র বিদ্রোহী সর্বত্র সক্রিয় ও পরস্পরের প্রতি মারমুখী তৎপরতায় লিপ্ত, যাদের পরস্পরের সংঘাত সংঘর্ষে প্রায়ই হতাহতের ঘটনা ঘটছে। চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ছিনতাই তো নিত্যদিনের ঘটনা। সেনাবাহিনীর অবর্তমানে এই ঘোলাটে অরাজক পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নিতে পারে। তাতে খোদ সন্তু বাবুদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। এই বিরূপ পরিস্থিতির আলোকে পার্বত্য অঞ্চলে সেনা উপস্থিতি মোটেও শিথিলযোগ্য নয়।

(শুক্রবার ৮ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ২১ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি)

জনসংহতি সমিতি স্বীয় সংশোধিত দাবীনামা প্রথম দফাতেই স্বীকার করেছেঃ আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন। কারণ দাবীটি হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় আর বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে এককেন্দ্রিক। এই সাংবিধানিক বৈপরিত্বকে জন সংহতি সমিতি জেনে শুনেই উপেক্ষা করে চুক্তি সম্পাদন করেছে।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ খোড়া হবে, এবং সদিচ্ছা ও সহানভূতি থাকা সত্ত্বেও সাংবিধানিক কারণে সরকারের হাত পা বাঁধা। ইউনেস্কো কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পার্বত্য চুক্তির জন্য শান্তি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্যারিসে সন্তু বাবুর উল্লসিত উপস্থিতি এ চুক্তির প্রতি তার চূড়ান্ত অনুমোদনই ব্যক্ত করে যা বিশ্ববাসীকে আশ্বস্থ করেছে। এখন তার ভিন্নতা করা হলে, তা বিশ্ববাসীর ঐ আস্থা বিনষ্ট করবে।

আওয়ামী সরকার সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকির ভিতর, ধীরগতিতে হলেও আঞ্চলিক ও উপজাতীয় ক্ষমতায়নে অগ্রসরমান ছিলো। বিএনপি দলীয়দের বিচারে এটি একটি ধোকা। এটা সংবিধান সম্মত নয় এবং কার্যত: কালোচুক্তি। তাই বিএনপি বা অন্যদের কার্যকালে এটির হুবহু বহাল থাকা অনিশ্চিত।

সন্তু বাবুরা নতুন আরেক চুক্তির কথা ভাবছেন। কিন্তু সেটি কখন কার সাথে হবে? সে মিত্র শক্তিটা কে?

আবার লড়বেন ও ঘোলাটে পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন? তাই কি স্বীয় সশস্ত্র কেডারদের বিপক্ষীয়দের নির্মূলে লেলিয়ে দিয়েছেন? চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস শুরুর উদ্দেশ্য কি তা-ই? এ কাজে বাঁধাহীন হওয়ার লক্ষ্যেই কি সেনা প্রত্যাহারের দাবী? কিন্তু তা কি সম্ভব?

বিদ্রোহী শান্তি বাহিনী ডেকে এনেছে সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালীদের। আবার বিদ্রোহ হলে, আরো কঠোর সেনা শাসন ও বিপুল বাঙ্গালীর উপস্থিতি হবে অনিবার্য। কারণ সকল যুক্তির বাড়া যুক্তি দেশের অখন্ডতা। বার বার ঘুঘুকে ধান খেতে দেয়া যাবে না।

পার্বত্য বিদ্রোহীদের দমনে মাত্র এক মাসের কঠোর ও দ্রুত সেনা অভিযানই যথেষ্ট। দীর্ঘস্থায়ী সেনা উপস্থিতি বা শাসনের প্রয়োজন নেই। উপজাতিদের দূর্বল ও সংখ্যালঘু করণের বাকি কাজটি সাধারণ বাঙ্গালীদের দ্বারাই সম্পাদন সম্ভব। মিত্র আওয়ামী লীগকে শত্রু বানিয়ে ছাড়লে, তারাই এতদাঞ্চলকে বাঙ্গালী উপনিবেশ করে ছাড়বে। আওয়ামী লীগের আগামী নির্বাচন জিততে এরূপ একটি দেশ জয়ী জনপ্রিয় ইস্যু ও ইমেজের প্রয়োজন।

জনসংহতি সমিতির সংশোধিত দাবীনামার ব্যাখ্যাতেই বলা হয়েছেঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ারধীন এলাকা মাত্র ৪৪৬ বর্গমাইল, যা এই লেখকের হিসাবে ৪৪০ বা ৩৪০ বর্গমাইল মাত্র। অবশিষ্ট ৪৬৪৬ বা ৪৬৫২ অথবা ৪৭৫২ বর্গমাইল হলো সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল। সুতরাং দাবী নং ২/৫ক ও ২-৫-খ অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের এখতিয়ারধীন অঞ্চল ৫০৯৩ বর্গমাইল ব্যাপ্ত গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। শান্তি চুক্তি, ৪৪৬

আ ৪৪০ অথবা ৩৪০ বর্গমাইলের উপর সীলমোহর এঁটে দিয়েছে। এখন উপজাতীয় অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মানে তিন জেলা পরিষদও আঞ্চলিক পরিষদের এখতিয়ারধীন বর্ণিত ক্ষুদ্র অঞ্চল। সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল এর অন্তর্ভূক্ত নয়। এটি পার্বত্য চুক্তির আরেক গূঢ় রহস্য। দ্রষ্টব্যঃ চুক্তিদফা খ-২৬ ও জেলা পরিষদ আইন ৬৪

চুক্তি হয়েছে চীফ হুইফ ও জ্যোতিরিন্দ্রী রোধিপ্রিয় লারমার মধ্যে, যাদের কেউ সরকারের পক্ষ্যে বা জনগণের পক্ষে কোন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নন। আওয়ামী লীগ ও তার প্রধান হাসেনার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় আপাততঃ এর বাধ্যবাধকতা মেনে মেপে চলা হলেও, এই মেনে চলা কায়েমী ও সরকারী সিদ্ধান্তজাত নয়। এই সরকার বা ভবিষ্যতের ভিন্ন সরকার এই বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করতে পারবে। এটি হলো চুক্তির প্রধান দুর্বলতা।

চুক্তিতে পার্বত্য অবাঙ্গালীদের উপজাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা উভয় পাক্ষিক সিদ্ধান্ত। এখন এর ব্যতিক্রম করে খোদ সন্তু বাবুরাই নিজেদের কখনো আদিবাসী ও কখনো পাহাড়ী আখ্যায়িত করছেন, যে নামে আইনে অগ্রাধিকার লিপিবদ্ধ নেই। তা হলে কি তারা উপজাতি পরিচয়টি প্রত্যাখান করছেন? এক সাথে তিন সংজ্ঞায় পরিচিত হওয়া তো চুক্তিতে অনুমোদিত নয়। এমনিতেও তিন সংজ্ঞায় পরিচিত হওয়া বিভ্রান্তিকর। উদ্দেশ্য কি গাছেরটাও পাড়া, তলারটাও কুড়ানো? এতো হলো সুবিধাবাদী নীতি।

প্রতিবেশী বৃহৎ সম্প্রদায় কর্তৃক বাঙ্গালীদের ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কি সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক, না শান্তির সহায়ক? সন্তু বাবু নিজে কি নাস্তিক না বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল ? মহামতি গৌতম বুদ্ধের অমর শিক্ষা কি তার স্মরণে আছে? যথাঃ সব্বে সত্তা সুখীতা ভবেন্তু। অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

কমিউনিজমের ভাবাদর্শ হলোঃ "ধর্ম আফিম তুল্য।" কিন্তু সে ভাবাদর্শ আজকাল পরিত্যক্ত ও সেকেলে। সন্তু বাবু কি সে পশ্চাদপদতার অনুসারী ধর্মত্যাগী? তাকে যে মাঝে মধ্যে বৌদ্ধ গুরু বনভান্তের আশীর্বাদ প্রার্থী হতেও দেখা যায়। এসব কি ভন্ডামী? যে নিজের ধর্মকে মানেন না, পর ধর্মকেও ঘৃণা করেন, তিনি তো ধর্মদ্রোহী। সন্তু বাবু ভন্ডামী কেন, সগর্বে বলুন আপনি নাস্তিক। এতদাঞ্চলের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সবাই জানুকঃ আপনি একজন বৌদ্ধ যাজক সন্তান হলেও, এখন ধর্মদ্রোহী বা নাস্তিক। বৌদ্ধ মতবাদ নয়, নাস্তিক্যবাদই আপনার ধর্ম। ধর্মের বিরুদ্ধে আপনার বিষোদগার তখন যক্তিসঙ্গত হবে। খবরদারঃ বিবাহ আর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কোন পুরোহিতকে ডাকবেন না। উইল করে যাবেন মৃত্যুর পর আপনাকে যেন সমাহিত বা পোড়ানো না হয়। কারণ এগুলো তথাকথিত ধর্মীয় উপাচার ও সংস্কৃতি। পার্বত্য বাঙ্গালী সমাজকে দ্বিখন্ডিত করতে আপনি পুরানবস্তিবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি দরদ দেখাচ্ছেন এবং আদিবাসী বাঙ্গালী নামে তল্পীবাহক সংগঠন গড়তে মদদ দিচ্ছেন। এর ফলে আপনাদের প্রতি বাঙ্গালী অবিশ্বাস ও সন্দেহ বাড়ছে। এই তল্পীবাহকদের সংখ্যা মোট পার্বত্য বাঙ্গালীর ৫% হবে কি না সন্দেহ। অতীতে এরা শান্তিবাহিনীর হাতে কম জবাই হয়নি। এদের ভবিষ্যৎ এখন ঘরে বাইরে সর্বত্র সন্দেহজনক। তারা না ঘরকা, না ঘাটকা। মনে হয়ঃ আবার অশান্তির খেলা জমছে, এসবই তার আলামত।

(তাং - সোমবার ১১ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ২৪ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি)

ইতোমধ্যে সন্তু বাবু কর্তৃক অনধিকার চর্চার এক উল্লেখযোগ্য কান্ড ঘটে গেছে। ইউ এন ডি পি বা ইউনাটেড নেশন্স ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম এর সাথে তিনি পার্বত্য অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাজ করার অনুমোদনমূলক একটি চুক্তি সই করেছেন। যে অধিকার একমাত্র সরকারের প্রাপ্য। কাজটি আপত্তিকর ও বিদ্রোহাত্মক জানা সত্ত্বেও এ নিয়ে সরকার চুপ। একমাত্র স্থানীয় এমপি বাবু দীপংকর তালুকদার (সাবেক) এ কাজটির সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন, এবং পত্র পত্রিকায় ও তা মুদ্রিত হয়েছে।

সন্তু বাবুরা, সরকার, আওয়ামী লীগ, ও বাঙ্গালীদের চৌদ্দ পুরুষ প্রায়ই উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে আওয়ামী সরকারের চুপ থাকা, ধৈর্য ধারণ বলে জ্ঞান করা যায়। কিন্ত জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউএনডিপির সাথে চুক্তি সম্পাদনকে মোটেও অবহেলাযোগ্য জ্ঞান করা যায় না। সরকার কি এই বাড়াবাড়িকে অঙ্কুরেই দমাবেন? চুক্তির কোথাও তো এরূপ অনধিকার চর্চার কথা লিপিবদ্ধ নেই। চুক্তির প্রতিটি দাড়ি কমা পর্যন্ত সন্তু বাবুদের মুখস্থ। এ ব্যাপারে ভূল হওয়ার অবকাশ নেই। এখন পর্যন্ত তারা ভুল স্বীকারও করেন নি। এটা তাদের ইচ্ছাকৃত টেষ্ট কেইস। সরকারের পক্ষ থেকে শক্তিশালী প্রতিবাদ ও রিরোধীতা না আসলে, অনুরূপ ঘটনা আরো ঘটবে, এবং আন্তর্জাতিকভাবে তৎপ্রতি উৎসাহ বাড়বে। দেখি আর কি হয়, এই অপেক্ষা তো মারাত্মক হতে পারে। অনুরূপ ঘটনাবলী উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের পক্ষে হবে উজ্জীবক। এমনিতে আঞ্চলিকভাবে উপজাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রশাসনিক অংশীদারিত্ব, স্বতন্ত্র স্থানীয় আইনের প্রাধান্য, অঞ্চলটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে রেখেছে। তদুপরি চুক্তিতে উপজাতীয় অঞ্চল হওয়ার স্বীকৃতি এবং আঞ্চলিক বামে পরিষদীয় ক্ষমতাদান ইত্যাদি স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে নিঃসন্দেহে অগ্রগতি। এবার আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বেপরোয়া চুক্তি সম্পাদন, চুড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যকে আরো নিকটবর্তী করারই পদক্ষেপ। এটা সরকারের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ এবং টেষ্ট কেইসই বটে।

আমরা কি করে আশ্বস্ত হবো যে, প্রয়োজনীয় একশনের যুক্তিসঙ্গত ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যই সরকার জনসংহতি ও তার নেতৃবৃন্দকে বাড়তে দিচ্ছেন। কিন্তু ততদিনে যে তাদের বাড় বিস্তার সীমা ছাড়িয়ে যাবে। উপড়াতে গেলে ডাল পালাই ভাংবে, জড় শিকড় থাকবে গভীরে প্রথিত। একশনের জন্য এই চুক্তি ইস্যুটি একটি বড় যুতসই বিষয়। এবার না দমালে, স্বাধীনতার যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন।

আগে উপজাতিদের পক্ষে চুক্তির রাজনৈতিক সাফল্য ও সুফলের প্রধান দিকগুলো বর্ণিত হয়েছে। তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক সুফল ও অর্থনৈতিক সাফল্যের বিরাট তালিকাটিও বিবেচ্য। যথাঃ (ক) আত্মসমর্পিত প্রত্যেক শান্তিবাহিনী সদস্যকে অনুদান প্রদান নগদ টাকা ৫০,০০০/- খ) সাত শতাধিক শান্তিবাহিনী সদস্যকে পুলিশে চাকুরী দান। গ) ফৌজদারী

মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার ঘ) আটক ও দন্ড প্রাপ্তদের জেল থেকে মুক্তি। ঙ) ঋণ খেলাপীদের ঋণমুক্তি চ) চাকুরী ও পেনশন পুনরবহাল। ছ) চাকুরীর বয়সসীমা ৪০ এ শিথিল। জ) শরণার্থী প্রত্যাবাসনে ২০ দফা পেকেজ সুবিধা দান। যথাঃ

১. জীবন সম্পদও নিরাপত্তার রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি।

২. গৃহ নির্মাণ ও কৃষি অনুদান, পরিবার প্রতি টাঃ ১৫০০০/-

৩. ১০০ পরিবারের প্রতিটির জন্য নিহত প্রতি শেষ কৃত্যানুষ্ঠান বাবদ অনুদান টাঃ ১০,০০০/- ।

৪. এক বছর পর্যন্ত প্রতি শরণার্থী প্রাপ্ত বয়স্ককে মাসিক ৫ কেজি ও অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ২.৫ কেজি হারে চাল ও পরিবার প্রতি ৪ কেজি ডাল, ২ কেজি সয়াবিন তেল ও ২ কেজি লবণ প্রদান।

৫. গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতি পরিবারকে ২ বান্ডিল ঢেউ টিন পান।

৬. চাষযোগ্য জমির মালিক প্রত্যেক পরিবারকে একজোড়া হালের গরু ক্রয়ের টাকাঃ ১০,০০০/-

৭. ভূমিহীন পরিবারকে বিবিধ ক্রয় বাবদ টা ৩,০০০/-

৮. ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ।

৯. অনুরূপ অন্যান্য ব্যাংক ঋণ মওকুফ।

১০. পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ।

১১. সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা এবং মামলা ও গ্রেফতারী আদেশ প্রত্যাহার।

১২. জমি বাড়ি বাগান প্রত্যার্পন, ধর্মীয় স্থান পূণরবহাল, এবং বিশেষ ভাবে ৭০টি মন্দির সংস্কার ও পূননির্মাণের জন্য মন্দির প্রতি অনুদান টাঃ ১০,০০০/-

১৩. শরণার্থী চাকুরীজীবিদের চাকুরী ও পেনশন পূনর্বহাল।

১৪. ছাত্র ছাত্রীদের এসএস সি-ও এইচ এস সি পরীক্ষা দান অনুমোদন ও স্কুল কলেজে ভর্তির সুযোগ দান।

১৫. গৃহ নির্মাণে কাঠের পারমিটের পরিবর্তে অনুদান টাঃ ৩,০০০/-

১৬. উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহে বেকার উপজাতীয় শরণার্থীদের অগ্রাধিকার মূলক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ প্রদান।

১৭. চাকুরীর বয়স সীমা উত্তীর্ণ শরণার্থী প্রার্থীদের বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ প্রদান।

১৮. অন্তর্ঘাতমূলক ফৌজদারী অভিযোগে সাজা প্রাপ্তদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান।

১৯. পর্যায়ক্রমে বেসামরিক এলাকা থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার।

২০. প্রত্যাগত হেডম্যানদের নিজ নিজ মৌজায় পূনর্বহাল।

বিদ্রোহ ত্যাগের বিনিময়ে এত বিরাট সুযোগ সুবিধা মানে তো সরকারেরই আত্মসমর্পণ। এতো উদারতা কি সন্তু বাবুদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? সরকারের পক্ষে অধিক উদারতার আর কি আছে?

উপজাতীয় স্বতন্ত্র রাজনীতি ও কিছু বাঙ্গালীর লেজুড় বৃত্তি

আদিবাসী আর আদিবাসিন্দা সমার্থক শব্দ নয়। এ দুটি শব্দ সংজ্ঞা হিসাবেও পৃথক। এই শব্দ ও সংজ্ঞা দুটি নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। পার্বত্য বাঙ্গালীদের মাঝে ক্ষুদ্র একদল তাবেদার সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজাতীয় জন সংহতি সমিতি কয়েকজন স্বার্থান্বেষী বাঙ্গালীকে পটিয়ে গড়ে তুলেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদ। এরা মৌখিক আদিবাসী বাঙ্গালী পরিচিত। এদের বক্তব্য পার্বত্য জনসংহতি সমিতির বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। অভিযোগ উঠেছে এবং উপজাতি ঘেষা পত্র পত্রিকারও খবর হলো, তথাকথিত আদি বাঙ্গালীদের কতিপয় নেতা রাঙ্গামাটিতে সেনা সদস্যদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন। এবং পরে পুলিশ কর্তৃক বিভিন্ন অভিযোগে তাদের তিনব্যক্তি গ্রেফতার এবং বিচারের জন্য সপোর্দ হয়েছেন। ব্যাপারটি অপ্রীতিকর হলেও স্থানীয় বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজে তার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। তবে মার চেয়ে মাসির দরদ বেশী। উপজাতীয় জন সংহতি সমিতি, তার দোসর ঐ বাঙ্গালীদের নিয়ে অত্যন্ত বেদনাকাতর ও সোচ্চার। স্থানীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এঁটাও তাদের একটি রাজনৈতিক ইস্যু। তারা নিজেদের প্রচার সহযোগীদের এ ঘটনার বিরূপ প্রচারণায় কাজে লাগিয়েছে। লক্ষ্যঃ সেনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে দেয়া। বিষয়টি অতি ক্ষুদ্র এবং উপজাতীয় সংশ্রব বর্জিত হলেও, সন্তু বাবুদের লক্ষ্যঃ বাঙ্গালীদের মাঝেও সেনা বাহিনীকে বিতর্কিত করা এবং নিজেদের তাবেদার বাঙ্গালী গোষ্ঠীকে দলে ভারি করে, বাঙ্গালী ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানো। ব্যাপারটিতে উল্টো ফল ফলতে শুরু করেছে। আদি বাঙ্গালীদের রাঙ্গামাটি জেলা সংগঠন, তার সভাপতি কর্তৃক বিলুপ্ত ঘোষিত হয়েছে। আর বান্দরবন জেলা সংগঠন স্থানীয় সম অধিকার আন্দোলনের সাথে একিভূত হয়ে গেছে। খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠনটিও বিলুপ্ত ঘোষিত, বা সম অধিকার সংগঠনের সাথে আত্মিকৃত হওয়ার পথে। আদি বাঙ্গালীদের ব্যাপারে জন সংহতি সমিতির অতি উৎসাহ আর সেনা বাহিনীকে কলুষিত করার অপচেষ্টাসহ বাঙ্গালীদের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির উপজাতীয় এই কু-মতলব কথিত আদিবাসী বাঙ্গালীদের সচেতন হতে সাহায্য করেছে। এঁটা স্থানীয় বাঙ্গালীদের উপদলীয় কোন্দল এবং উপজাতীয় লেজুড়বৃত্তি পরিহারে সহায়ক হয়েছে।

রাজনৈতিক ভাবে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোক আর বাঙ্গালীরা দুই পৃথক সমাজে বিভক্ত। এখানে বিপক্ষদের সাথে লেজুড়বৃত্তি অবশ্যই অনাকাঙ্খিত। পার্বত্য চুক্তি

ও জেলা পরিষদ আইন, বাঙ্গালী ও উপজাতীয়দের মধ্যকার বিভেদ ও পার্থক্যকে প্রকট করে তুলেছে। বাঙ্গালী হলে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদের অযোগ্য। কর্ম সংস্থান, শিক্ষা বৃত্তি আর উচ্চ শিক্ষায়ও বাঙ্গালীরা অবহেলিত। বাঙ্গালীদের ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন্যই বন্দোবস্তি আর হস্তান্তর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এটিতো দুই দেশ আর দুই জাতিমূলক পদক্ষেপ। এই ভিন্নতা এক দেশ ও এক জাতি সত্তা গড়ে উঠার বিরোধী, যা দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান অনুমোদন করেনা।

কোন্ স্বার্থে বাঙ্গালীরা উপজাতীয় লেজুড় বৃত্তিতে সংশ্লিষ্ট হবে? হ্যাঁ কিছু গম চাল ও নগদ অর্থ, গরীব বাঙ্গালীদের মাঝে ছিটিয়ে, তাদের লেজুড়বৃত্তিতে নিয়োজিত করা হচ্ছে, যে গম চাল ও অর্থ জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান আর উপজাতীয় মন্ত্রীদের হাতে সরকার থেকেই ত্রাণ উপকরণ রূপে প্রদত্ত হয়।

আদি বাঙ্গালী আখ্যা, বাঙ্গালী ধরার একটি টোপ মাত্র। এই সংজ্ঞাটি, পার্বত্য চুক্তি বা জেলা পরিষদ আইনের কোথাও উল্লেখিত নেই। গরীব অশিক্ষিত কিছু বাঙ্গালীকে এই টোপ আর ত্রাণ সামগ্রীর বিনিময়ে সন্তু বাবুরা নিজেদের লেজুড় রূপে ব্যবহার করছেন এবং গোটা দেশবাসী বাঙ্গালীদের বুঝাচ্ছেন, তারা অসাম্প্রদায়িক, বাঙ্গালী স্বার্থ বিরোধী নন। তাদের সংগঠনের নামটি ও সার্বজনীন। পার্বত্য জন সংহতি সমিতি যেমন সাম্প্রদায়িক নাম ধারণ করেনা, তেমনি পার্বত্য অঞ্চলের আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালীদেরও সে সমর্থক। সে কেবল লুটেরা সেটেলার বাঙ্গালীদের সম্মানজনক প্রত্যাবাসন কামনা করে। তারা নিজেদের স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাক। পার্বত্র অঞ্চল সেটেলার মুক্ত হোক। এই অঞ্চলের আদি স্থায়ী বাঙ্গালী আর উপজাতীয়রা ফিরে পাক তাদের স্ব স্ব ভূমি ও স্বাভাবিক অবস্থান।

এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যে কিছু বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী নিতান্তই আহ্লাদিত। তারা বুঝতে অপারগ যে, সেটেলার বাঙ্গালীদের অবর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় এমন সংখ্যা প্রাধান্য সৃষ্টি হবে, যা হবে এতদাঞ্চলের উপজাতীয় স্বতন্ত্র দেশ গঠনের সহায়ক। পাক ভারত বাংলা উপমহাদেশের রাজনৈতিক জন্ম ইতিহাস হলোঃ ভারত ও পাকিস্তান হিন্দু ও মুসলিম প্রাধান্যের পরিণতি। বাংলাদেশ বাঙ্গালী প্রাধান্যের ফল। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্যের বলে স্বাধীন উপজাতীয় রাষ্ট্রের পরিবেশ লাভ করেছে, এঁটা বিচ্ছিন্নতার সূত্র। এই বিভক্তির পথ অনুসরণ বাংলাদেশের পক্ষে আত্মহত্যাকর। সুতরাং এই অঞ্চলে বাঙ্গালী সেটেলম্যান্ট, বাংলাদেশের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করণেরই পদক্ষেপ। উপজাতীয়দের দয়ার উপর এদেশের অখন্ডতাকে ছেড়ে দেয়া যায় না। অখন্ডতা রক্ষার পক্ষে উপজাতীয়দের দৃঢ় অঙ্গিকার ও নেই। তাদের অতীত ইতিহাস হলো বিদ্রোহ আর অবাধ্যতার ইতিহাস। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অবর্জনীয়।

১৭২৪ সালে উপজাতীয় সর্দার জালাল খাঁ, ১৭৭৪ সালে চাক্‌মা সর্দার শের দৌলত খাঁ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে চাকমা ও মগেরা বিদ্রোহ করেছে এবং এই

ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ পরবর্তী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। এই বিদ্রোহ বিরোধী পদক্ষেপকে উপজাতীয় উৎপীড়ণ বলা সমীচীন নয়। প্রতিরক্ষা উৎপীড়নের সমার্থক ও নয়। উপজাতীয় বিদ্রোহী আর তাদের সমর্থকেরা নির্বিচারে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রপক্ষীয় শক্তিকে হেনস্তা ও দোষারোপ করে থাকেন, যা তাদের সদিচ্ছাকে উদ্ভাসিত করেনা। একদেশ ও এক জাতি গড়ার পদক্ষেপ, কোন মতেই শৈথিল্য ছাড় আর আপোষ রফার বিষয় নয়। উপজাতি লালন আর তাদের প্রতি নমনীয় হওয়ার অর্থ কোন মতেই তাদের প্রতি অবিচার আর দেশকে বিভক্ত করা নয়।

বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের স্বদেশ। বাঙ্গালী লোক সমাজ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, এদেশটিকে বাংলা নামে ভূষিত ও স্বাধীন করেছে। এর আদিবাসীন্দদের ৯৯% বাঙ্গালী। এ দেশে বাঙ্গালী আদিবাস প্রশ্নাতীত। বাঙ্গালীরা বাংলাদেশের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা, এটা অবিসম্বাদিত বিষয়। বাঙ্গালী হওয়াটাই এ দেশের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সনদ। তবে যেহেতু দুনিয়ার তাবৎ বাঙ্গালীরা জন্মগত ভাবে বাংলাদেশ ভূখন্ডের বাসিন্দা নয়, এবং এখানকার জন্মগত ১% অধিবাসী অবাঙ্গালীও বটে, সেহেতু ভূখন্ডগত নাগরিকত্বের প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত হতে, এদেশবাসী প্রত্যেকের কার্যত: বাংলাদেশী জাতি হওয়া জরুরী। তবে এঁটা আঞ্চলিক বিষয় নয়। রাষ্ট্রই এই সনদ দানের অধিকারী। নাগরিকত্ব দেশ ভিত্তিক বিষয়, অঞ্চল ভিত্তিক নয়। দেশের মুল নাগরিক বাঙ্গালীরা কেবল বিদেশী ও বিজাতীয় হওয়া ছাড়া, দেশের কোথাও অস্থানীয় অস্থায়ী অভিহিত হতে পারেনা। এক মাত্র পার্বত্য অবাঙ্গালী রাজনীতিকদের কিছু লোক এই বাঙ্গালী বিদ্বেষী প্রশ্ন নিয়ে সোচ্চার। এটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন নয়। স্থানীয় অস্থানীয় স্থায়ী অস্থায়ী এই প্রশ্নে প্রশ্রয় দিলে, গোটা দেশ ও জাতি খন্ড বিখন্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোথাও কোন অঞ্চল বাসীর একক আধিপত্য স্বীকৃত নেই। সর্বত্র মিশ্র জনগোষ্ঠী বসবাস করে, এঁটাই বাস্তবতা। উপজাতীয় দাবী অনুযায়ী বসবাস ও সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে স্থানীয় অস্থানীয়, স্থায়ী অস্থায়ীর বিভাজন স্বীকৃত হলে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী জাতিসত্তা হবে বিপন্ন। সবাই নিজ নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। বাইরের কোথাও বসবাস চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি হবে বিতর্কিত। সেটাতো একদেশ ও এক জাতি ভিত্তিক কাম্য পরিবেশ হবেনা। আমি বাঙ্গালী। জন্মসূত্রে এ দেশের বাসিন্দা। আমার নাগরিক অধিকার এ দেশের কোথাও চ্যালেঞ্জ যোগ্য নয়। অস্থানীয় অস্থায়ী প্রশ্ন তুলে আমার বসবাস ব্যবসা, চাকুরী, প্রতিনিধিত্ব, পদ লাভ, ভূমি অধিকার ইত্যাদি বাধার সম্মুখীন হতে পারেনা। এদেশে জন্মগ্রহণকারী অবাঙ্গালীরা ও অনুরুপ অধিকার লাভের অধিকারী। এঁটা প্রদত্ত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। দেশের একদল লোক অর্থ, ভেতো মদ, আর নারী লুলোপতায় এই দেশ ও জাতিকে বিক্রি করে দিতেও পিছ পা নয়। উপজাতীয়দেরই স্থানীয় ও স্থায়ী নাগরিকত্বের সনদ থাকা জরুরী। তারা ত্রিপুরা, মিজোরাম ও আরাকানের পৈতৃক স্বদেশ ত্যাগী বহিরাগত নয়, এই সার্টিফিকেট ধারী হতে হবে। এই কয়েক বছর আগেও স্বদেশ ত্যাগী কিছু ত্রিপুরা ও পাংখু, সাজেক এলাকায় এসে অধিবাস গ্রহন করেছে। মাত্র বছর

কয়েক হয়েছে, বান্দরবনের নাক্ষ্যংছড়িতে নতুন নামের একদল উপজাতীয় আরাকান ছেড়ে এসে বাড়ি ঘর পেতেছে। এইতো উপজাতীয়দের অব্যাহত অভিবাসনের চিত্র। এদের জায়গা করে দিতে, এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন আবশ্যক, এটি অতি উৎসাহী অদ্ভুত দাবী।

চট্টগ্রাম একটি ঐতিহাসিক ভৌগোলিক অঞ্চল, যার অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই উভয় অঞ্চলের মূল আদি বাসিন্দা হলো চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী। কোন উপজাতীয় লোকই আজ পর্যন্ত দাবী করেনি যে, তারা ঐ চট্টগ্রামী মূলের লোক। তারা নামেই বিদেশী বিজাতি পরিচিত। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের লোক। মিজো, লুসাই, পাংখো, বনযোগীরা মিজোরামের আদি বাসিন্দা। মগ বা মারমা রাখাইন রিয়াং খিয়াং, চাক, ম্রু বা মুরুং ইত্যাদি জন গোষ্ঠী, আরাকান ও চীন পর্বতাঞ্চলের আদি অধিবাসী। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের নিজেদের কথা কাহিনীতেই বর্মী ও আরাকানী দাবীদার। এখানে তাদের ঐ বিখ্যাত গানটি স্মরণীয় যথাঃ

"আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ি, তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।"

তাদের আরাকানী হওয়ার আরো অকাট্য দলিল হলো, চাকমা রাজা শের জব্বার খানের সীল মোহর, যেটিতে তাদের আরাকান বাসের কথা বিবৃত হয়েছে। এই সীল মোহরটি প্রত্ন নিদর্শন রুপে রক্ষিত আছে।

আমরা বাংলাদেশী বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের প্রতি উদার। বিদেশী বিজাতীয় বংশোদ্ভুত হলেও তাদের বহিস্কার দাবী করিনা। চার চার বার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি নমনীয়। কৃতজ্ঞতারূপে এর প্রতিদান প্রদেয় হলেও তারা এর ভিন্নতাই করে। এই অবাধ্যতার কারণেই এদের ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হবে। দেশে বিদ্রোহী অঞ্চল ও অবাধ্য জনগোষ্ঠী রাখা বিপজ্জনক। যেখানে উদারতা নিষ্ফল, সেখানে সংস্কার ও সংশোধন নীতি আরোপ ছাড়া উপায় নেই। উচ্চ পদ ক্ষমতা অগ্রাধিকার প্রদানেও কাজ হয়নি। এবার সমীকরণ দরকার। এঁটা উৎপীড়ণ নয়, মগজ ধোলাই। এক সমতলে আনয়ন ছাড়া বাঙ্গালী পাহাড়ীর পক্ষে একজাতি হওয়া সম্ভব নয়।

(তাং শুক্রবার ৪ আষাঢ় ১৪০৬ বাংলা ১৮ জুন ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী এককেন্দ্রিক এই দেশে দু'ধরনের শাসন ব্যবস্থা অনুমোদিত, যথা ঃ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন। অনুচ্ছেদ নং ১ এর বিধান বলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শাখা হলো বিভাগ জেলা, উপজেলা বা থানা প্রশাসন। এবং স্থানীয় কর্তৃত্বের শাখা হলো স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সম্বলিত কর্তৃপক্ষ, যথা ঃ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি। এই মূল্যায়নে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় শাসনভূক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই বিধান করা হয়েছে, আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব হবে ঃ

২২ (ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন..

(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্তাবধান ও সমন্বয় সাধন। (সূত্র ঃ পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইন)

এতদসত্ত্বেও এই পরিষদ দুটির আইনী সংস্থান ও মর্যাদার ব্যাপারে প্রশ্নাদি বিদ্যমান। এখন পর্যন্ত কোন বিবরণে এটা পরিষ্কার নয় যে, সংবিধানের কোন আইনে এ দুটি গঠিত। যদি এ দুটি স্থানীয় শাসনের অধিক আরো বর্ধিত মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তা হলে কোন বিধান বলে, এ পরিষদগুলোর রাজনৈতিক মর্যাদা প্রাপ্য। সাংবিধানিকভাবে দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় না হওয়ায়, আঞ্চলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাজ্য মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু আঞ্চলিক মর্যাদায় এতদাঞ্চলকে উন্নীত করা হয়ে গেছে এবং এ থেকে পিছানো বিব্রতকর, সেহেতু এই আঞ্চলিক পরিষদকে বিভাগীয় মর্যাদায় সমুন্নত করাই স্বস্তিকর। স্থানীয় শাসন আইনেই এমনটি করা সম্ভব। নতুবা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক এককেন্দ্রিকতা রক্ষিত হবে না, এবং অসন্তুষ্ট ভিন্ন পক্ষীয়রাও প্রবোধ মানবে না। এ কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, রাষ্ট্রীয় শাসন প্রশাসন, ইউনিটারী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন বিষয়। রাষ্ট্রের ভিতর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করা ছাড়া অঞ্চল ভিত্তিক কর্তৃত্ব দান সম্বব নয়। সে পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদ বা সরকারের মর্যাদা লাভের আশা সুদুর পরাহত। তবে স্থানীয় শাসন কাঠামোতে কিছু রদ বদল ও যোগ বিয়োগ সাধন সম্ভব। রাষ্ট্রকে ইউনিটারী রেখেও, শিথিল কাঠামোতে পূনরগঠন করা অসম্ভব নয়। এ নিয়ে সরকার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ভাবনা ও গবেষণার দরকার আছে।

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আঃ রউফের স্মৃতিস্তম্ভ বুড়িঘাট, নান্যারচর, রাঙ্গামাটি

নিষ্ফল তোষণ ও বিপজ্জনক ক্ষমতায়ন

(তাং-বুধবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ১৯ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

ঔপনিবেশিক বৃটিশ নীতির লক্ষ্য ছিলোঃ আদিম অনুন্নত সংখ্যালঘুদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দান ও তাদের মাঝে একদল অনুগৃহীত বশংবদ সৃষ্টি, যারা শাসন শোষণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে হবে সহযোগী । ভারত দখলের পর তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হয়, যার প্রথম দেশটি হলো বার্মা । সীমান্ত বিরোধ ও দেশান্তরী শরণার্থী সমস্যাই বৃটিশ ভারতের পক্ষে বার্মার উপর হস্তক্ষেপ করার অজুহাত সৃষ্টির সহায়ক হয় । এবং সে কাজে সহায়ক শক্তিরূপে গন্য হয়, বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক বিতাড়িত আরাকানীরা । যারা রাজ্যহারা উদ্বাস্তু রূপে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বের পাহাড়ী সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলো । তখনকার ঐ রাজনৈতিক চাহিদারই ফল হলো আরাকানী উদ্বাস্তুদের অভিবাসন মঞ্জুর এবং তাদের সর্দারদের আধিপত্যের স্বীকৃতি দান, যার প্রশাসনিক ও আইনী ব্যবস্থা হলো ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পৃথক জেলা গঠন, যেখানে অভিবাসী উপজাতিরা হলো সংখ্যা গুরু । পরে জারি করা হলো স্থানীয় আইন রেগুলেশন নং ১/১৯০০, যা প্রতিষ্ঠিত করে একটি সহযোগী উপজাতীয় প্রশাসন । সুচনাতেই পরিস্থিতি ছিলো বাঙ্গালী থাকায় প্রতিকূল এবং প্রশাসনিক আনুকুল্যের অভাবেও বটে, এতদাঞ্চলে আর বাঙ্গালী বসতি গড়ে উঠেনি । এই বিজাতীয় আধিপত্য এককালে এ দেশীয় রাষ্ট্রীয় স্থিতি ও অখন্ডতাকে চ্যালেঞ্জ করবে, তা ভাবার ফুরসৎ প্রয়োজন ও আগ্রহ তখন বৃটিশদের ছিলো না । তবে তারা আরাকান ও বার্মা দখলে সে দেশীয় উদ্বাস্তু ও তাদের পরিজনদের সহায়তা লাভ করেছিলো । এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের ও উর্বর ক্ষেত্র লাভে সক্ষম হয়েছিলো । যদিও তা ছিলো ধীর গতিক ।

এখন পরিবেশ ও পরিস্থিতি পাল্টেছে । বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাবনাকে স্থানীয় পলিসি নির্ণয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে । এবং এ কথাও ভাবতে হবে যে, দেশের ১/১০ অঞ্চলে ১/২% উপজাতীয় লোকের একাধিপত্য বহাল রাখা, অখন্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক হবে কিনা? কোন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার ভিত্তি হলো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রান্তিক অবস্থান, তাদের সংখ্যাগত একাধিপত্য, এবং নিজেদের জাতীয় ভিন্নতা । এই বৈরী পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান । স্বাধীনতার দাবী হালে না ওঠা, সাময়িক ব্যাপার, যা চিরস্থায়ী স্বস্তির কারণ নয় ।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সমস্যাটির স্থায়ী সমাধানে মূল জাতীয় জনগোষ্ঠীর আবাসনের প্রয়াস চালিয়েছেন । কিন্তু তার অবর্তমানে পরবর্তী প্রশাসন সে

কাজটি থেকে পিছিয়ে যায় এবং পরিবর্তে উপজাতীয় তোষণ ও ক্ষমতায়ণকে সমাধান রূপে গ্রহণ করে, যার পুনরাবৃত্তি অদ্যাবধি চালু আছে। কিন্তু বলা যায়, মূল অখন্ডতার সমস্যা তদ্বারা মিটান যায়নি। বিদ্রোহের ত্বরিত দুঃসাহসী উদ্যোগ আবার অনিবার্য হয়ে দেখা দিবে, সেদিন হয়তো দূরে নয়।

তোষামোদ ও সুবিধা দান নীতি সুফল দেয়নি, বরং তা বৈরীতার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, এ বলা অত্যুক্তি নয়। পরিস্থিতির মূল্যায়নই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ১৯৭২ সালে উপজাতীয় বিদ্রোহী সংগঠন পার্বত্য জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়, এবং তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। যাদের চাঁদাবাজি, লুটপাট, উৎপাত, অগ্নিসংযোগ ও আক্রমণে সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে ওঠে অশান্ত। প্রতিদ্বন্দী এক বিদ্রোহী প্রশাসনই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালে নদী বন্দর সুবলঙ্গে তাদের সাথে পুলিশের প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে শান্তি বাহিনীর পক্ষে কিছু হতাহত ও ধৃত হয়। সেই ঘটনার লাশ সংরক্ষিত না থাকলেও, তাতে ধৃত দুই আসামী এখনো মুক্ত ও জীবিত আছেন। মরহুম শেখ মুজিবের সরকার, তাতে শংকিত হয়ে, শান্তি রক্ষী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি এবং দীঘিনালা ও রোমায় সেনা নিবাস স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। দলীয়ভাবে বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগও তখন গৃহীত হয়। এ পদক্ষেপগুলো অবিলম্বে কার্যকরী হতে শুরু করে। তবে বিদ্রোহী পক্ষ তাতে আরো মারমুখী হয়ে ওঠে। তাদের কার্যক্রম সমান্তরাল সরকারেরই রূপ ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে দেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, এবং শেখ মুজিবের হত্যা ও তার আওয়ামী সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তী উত্থান পতনে সেনা প্রধান রূপে জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হোন, এবং বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়িতে শংকিত হয়ে, তিনি শেখ মুজিবের সুচিত পদক্ষেপকে আরো শক্তিশালী করে তুলেন। তার আপোষ চেষ্টার ব্যর্থতায়, বাহিনীগত শক্তিবৃদ্ধির পাশাপাশি, বাঙ্গালী আবাসনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহের বিপরীতে, বাহিনীগত শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙ্গালী আবাসন হলো একটি অনিবায্য ধারাবাহিক সরকারী প্রক্রিয়া, যার মূল আওয়ামী সরকারী আমলে নিহিত। তার সুনাম বদনাম এককভাবে জিয়া সরকারের প্রাপ্য নয়, এবং বিদ্রোহের স্থান কালও জিয়ার আমলে সীমাবদ্ধ নেই।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে এসে পূর্বের কঠোর পার্বত্য নীতির মৌলিক পরিবর্তন ও তার স্থলে সুযোগ সুবিধা ও তোষণনীতির প্রবর্তণ ঘটে, যার সুফল ভোগী প্রধান পক্ষ হলো উপজাতীয়রা। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীরা তাতে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ। কঠোর নীতির ত্বরিত বাস্তবায়ন, এরশাদ আমলে আরো কিছু দিন অব্যাহত থাকলে, উপজাতীয়রা স্থানীয় বাঙ্গালীদের তুলনায় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যেতে বাধা হতো, যার সুফল হতো, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পক্ষে চিরস্থায়ী সমাধান। আজ উপজাতীয় সন্তোষ ও ক্ষমতায়নের পিছনে দৌড়ানোর কোন প্রয়োজনই হতো না। তাই বলা যায়ঃ অদুরদর্শিতা বশতঃ সমাধানকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। পরিবর্তে তোষণ ও ক্ষমতায়নের যে সমাধানকে অভ্যর্থিত করা হচ্ছে, তা পরিণামে উপজাতীয় উভ্যুত্থানের মদদ যোগাচ্ছে। তেমন অবস্থার ফলপ্রসূ রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগ হবে অত্যন্ত কঠিন। আভ্যন্তরীন স্বশাসন দাবীর মীমাংসায় আন্ত

র্জাতিক হস্তক্ষেপ, বাস্তবরূপে পূর্ব তিমুর ও আলবেনীয় জাতি গোষ্ঠীর পক্ষে বসনিয়ায় উপস্থিত হয়ে, ইন্দোনেশিয়াও সার্বিয়াকে চেপে ধরেছে। এটি আমাদের পক্ষে আগাম সতর্ক উদাহরণ । তবে বাংলাদেশের সুবিধাজনক অবস্থান ও যুক্তি হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতি বা অবাঙ্গালীরা, স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়, বহিরাগত অভিবাসী এবং বর্তমানে বাঙ্গালীদের তুলনায় সংখ্যালঘু। ঔপনিবেশিক বৃটিশের স্বার্থে এবং তাদর আমলেই তাদের আগমন ও অভিবাসন ঘটেছে। বাংলাদেশের মূল আদি বাসিন্দা বাঙ্গালীদের স্বদেশের এই অংশে অধিবাস গ্রহণের অধিকার মৌলিক। স্বদেশের সর্বত্র তাদের সংখ্যাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ন্যায় সঙ্গত। দেশকে অখন্ড রাখার প্রয়োজনে কোন বিশেষ অঞ্চলে ভিন্ন কোন জনগোষ্ঠীগত প্রাধান্যকে ভেঙ্গে দেয়া অন্যায় বা নির্যাতন নয়। ভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা অবশ্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমানাধিকার পাওয়ার অধিকারী। রাষ্ট্র তজ্জন্য যত্নশীল আছে। সংখ্যা গুরু বাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীভূক্ত লোকদের ও দায়িত্ব হলোঃ সংখ্যালঘুদের লালন পালন ও ভালবাসা দান। যা তারা পালন করছে।

(তাং-বুধবার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ২৬ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

এটা বিবেচনার বিষয় যে, বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বে ও বর্ণিত সংখ্যালঘুরা অশান্ত আর অসন্তুষ্ট। তা হলে কি বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন অন্যায় কিছু? এবং এগুলো বাঞ্ছিত সুফল দানে ব্যর্থ? তা হলে এই সুযোগ সুবিধাগুলোর পুনরমূল্যায়ন আবশ্যক।

বিশেষ সুযোগ সুবিধার খতিয়ানটি এখানে বিবেচ্য, যথাঃ

১। তিন উপজাতীয় গোষ্ঠী প্রধানদের আনুষ্ঠানিক চীফ বা সর্দার পদ মর্যাদা প্রদত্ত হয়েছে। যারা সরকারী মাসোহারা পান, নিষ্কর কিছু জমি ভোগ দখল করেন। তারা সামাজিক বিচার ও বিরোধ মীমাংসা, দন্ড দান ও সাময়িক আটক করে রাখার অধিকারী। তারা নিজ নিজ সমাজ ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত সার্কেল বা পরগণার সহযোগী প্রশাসক ও তার ভিতরকার জুম চাষীদের জুম কর আদায় ও তা হিসাব মত সরকারকে সরবরাহের দায়িত্ব প্রাপ্ত তহসীলদার ও বটে। এই দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত তারা পরিশ্রমিক রূপে জুম করের বৃহদাংশ, ভূমি করের একাংশ, জরিমানার একাংশ বিভিন্ন সুপারিশ সনদপত্র বাবদ স্বেচ্ছা প্রনোদিত মোটা অংকের সালামী ও নজরানা প্রাপ্য হোন। তারা বেগার সেবা গ্রহণ করেন এবং সদর মৌজার হেডম্যান রূপেও ঐ পদের প্রাপ্য সুবিধাদি ভোগ করে থাকেন। এই নিযুক্তির বলে তারা রাজা রূপে সাধারণে সম্বোধিত। তাদের রাজত্ব হলো সার্কেলরূপী এলাকা, যা সংরক্ষিত বনের বহির্ভূত অঞ্চলের কম বেশি তিন ভাগে বিভক্ত গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই অভিনব রাজত্বরূপী সার্কেল আসলে তাদের পুরুষানুক্রমিক কোন রাজ্য নয়, এবং তাতে তারা মালিকানা স্বত্বধারী কোন জমিদারও নন।

২। চাকমা, মাং ও বোমাং নামীয় তিন উপজাতীয় সার্কেল ৩৭৩ টি মৌজায় বিভক্ত। তাতে সর্দারের অধীন নিযুক্ত হোন হেডম্যান বা মৌজা প্রধান এবং ঐ হেডম্যানদের অধীন পাড়া প্রধানরূপী কারবারীরা। তারা প্রত্যেকে সরকারী মাসোহারা ও প্রতি মৌজায় ইজমালী

নিষ্কর ৫০ একর সার্ভিস ল্যান্ড ভোগ দখল করেন। নিযুক্তি ও দায়িত্বের ক্ষমতা বলে চীফ ও হেডম্যানরা সমুদয় খাস জমি রাষ্ট্রীয় বন ও আবগারী সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। বিপরীতে জেলা প্রশাসকের তাদের প্রশ্নাতীত আনুগত্যের অধিকারী। অন্যথায় তাদের নিযুক্তি বাতিল যোগ্য। কিন্তু বাস্তবে এরূপ কঠোরতা কখনো আরোপ করা হয় না। এই শৈথিল্যের ফলে চীফ ও হেডম্যানেরা অনেক ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে ক্ষমতা খাটান এবং সরকারকে রাজনৈতিক বিশৃংখলায় সহায়তা দান থেকে বিরত থাকেন। যদিও তাদের দায়িত্ব হলো জেলা প্রশাসকদের পক্ষে আইন শৃংখলা রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া, রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও উৎপাদন সংক্রান্ত পরিবর্তনাদির তথ্য যোগান এবং বিশেষতঃ শাসন ও প্রশাসন সংক্রান্ত সহায়তা ও সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি।

তিন চীফকে নিয়ে জেলা প্রশাসকদের অধীন এক এডভাইজারী কাউন্সিলের কাগজে কলমে অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে তার কোন কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায় না, অথবা কোন চীফ বা হেডম্যানের স্থানীয় সংকট সমস্যার সমাধানে সরকারের সহায়তায় স্বতঃপ্রবৃত্ত এগিয়ে আসা ও বিরল। প্রকৃতি ও পরিবেশের পক্ষে জুম চাষ ক্ষতিকর পেশা এবং জুম করে সরকারী অংশটাও বার্ষিক মাত্র লাখ টাকার কম অতি নগণ্য। এ হেন ক্ষতিকর ও অলাভজনক পেশাটি কেবল চীফ হেডম্যান ও কার্বারী পোষণে নিয়োজিত আর অব্যাহত আছে। সরকার প্রতিদানে কিছু না পেলেও, এই অভিজাত শ্রেণীকে মাসোহারা, ভূমি কমিশন, জুম করের বৃহদাংশ সালামী ও নজরানা লাভের সুযোগ দিয়ে রেখেছেন।

৩। সাধারণের প্রাপ্য সুযোগ হলো, প্রত্যেক উপজাতীয় ব্যক্তি মফস্বলে বিনা বন্দোবস্তি তে তিরিশ শতক জায়গা ভোগ দখলের অধিকারী। একটি জুমিয়া পরিবার বিনা বন্দোবস্তি তে যে কোন খাস পাহাড়ে প্রয়োজনীয় জমি নিয়ে জুম চাষ করার পক্ষে নীরব অনুমতি প্রাপ্ত। নিজের গৃহস্থালী প্রয়োজনে যে কোন উপজাতীয় লোক বনজদ্রব্য আহরণ ও ব্যবহারে বাধাহীন। খাস পাহাড় ও রাষ্ট্রীয় বন এ জন্য উন্মুক্ত। চাষের জন্য জমির প্রয়োজন হলে প্রাথমিক আবাদকালীন তিন বছরের জন্য স্থানীয় হেডম্যানই কোন উপজাতীয় প্রার্থীকে খাজনা সালামীহীন পত্তন অনুমতি দানের অধিকারী, তৎপর এই দখলাধিকারের ভিত্তিতে, জেলা প্রশাসক থেকে নিয়মিত বন্দোবস্তি লাভ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এরূপ অধিকার হলো চলমান প্রথাসিদ্ধ বিষয়।

সারাদেশে জমি নিয়ন্ত্রণ ও খাজনা আদায় তহসীলভূক্ত দায়িত্ব। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই নিয়ম বিধির প্রবর্তন কাম্য ছিলো। কিন্তু এখানে ভিন্ন নীতি প্রচলিত থাকায়, খাস জমির উপর প্রথাগত অধিকারের দাবী উঠছে। বাধা আসছে, বনায়ন ও বাঙ্গালী পক্ষে বন্দোবস্তি দানে। এটা উপজাতীয়দের প্রদত্ত সুবিধা সুযোগের কুফল। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলই এই প্রথা ব্যবস্থাও সুবিধাবাদের ধারক। এখন এই আইনটির অবসানই উপজাতীয় প্রথা ব্যবস্থা ও প্রশাসন থেকে মুক্তি সহ স্বাধীন গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ভোগের উপায়।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক আমলের পার্বত্য নীতিতে অতীত পশ্চাদপদতা নিহিত। আইন ও প্রশাসনে এখনো পরাধীন আমল টিকে আছে। বৃটিশ প্রবর্তিত উপজাতীয় প্রশাসন এখন

নতুন আইনের ছত্রছায়ায় আরো শক্ত ও শক্তিশালী হয়েছে। চীফরা আগে ছিলেন জেলা প্রশাসকদের বাধ্য অনুগত। এখন তারা সনদ দাতা কর্তৃপক্ষ। যে ক্ষমতা আগে ছিলো জেলা প্রশাসকদের দায়িত্বাধীন।

মূলতঃ সর্দাররা উপজাতীয় চীফ। তাই তাদের পদবি হলো চাকমা চীফ, মাং চীফ, ও বোমাং চীফ। বাস্তবে কোন অউপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তারা প্রত্যক্ষভাবে জেলা প্রশাসকদের অধীন সামন্ত। কিন্তু এখন উপজাতি অউপজাতিদের উপর চীফদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়েছে। তারা স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা কিনা, তার চূড়ান্ত প্রত্যয়ন বা সনদ দান ঐ তাদেরই করায়ত্ত। সামন্তবাসী সর্দারী কর্তৃত্ব স্বাধীন দেশে প্রযোজ্য নয়, এবং তা প্রবর্তনকারী আইনটিও অবৈধ। আইনতঃ জেলা প্রশাসকই স্থানীয় প্রধান নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। তিনি জেলা হাকিমও বটে। একাধারে তিনি দেওয়ানী ফৌজদারী রাজস্ব ও প্রশাসনিক এখতিয়ার সম্পন্ন সরকারী প্রতিনিধি রূপী স্থানীয় প্রধান। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দার পরিচয়মূলক সনদ প্রদান তারই দেওয়ানী ও নির্বাহী এখতিয়ার ভূক্ত বিষয়। উপজাতীয় সর্দার বা চীফদের কারো এরূপ ব্যাপক সরকারী এখতিয়ার নেই। তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রধান হিসাবে, তাদেরকে সনদ সার্টিফিকেট দিবার অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু অন্যদের বেলায় তারা অনুরূপ এখতিয়ার প্রাপ্ত কেউ নন। তাদের কোন নির্বাহী ও দেওয়ানী ক্ষমতা প্রাপ্য নয়। অথচ বিস্ময়কর হলোঃ নতুন জেলা পরিষদ আইনে তাদেরকে সার্বজনিন সনদ সার্টিফিকেট দাতা কর্তৃপক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। তা হলে কি তারা জেলা প্রশাসকদের সমান্তরাল নতুন নির্বাহী ও দেওয়ানী কর্তৃপক্ষ? জেলা প্রশাসকদের উক্ত ক্ষমতাবলী কি বিভক্ত? তা না হলে চীফদের সনদ ছাড়া কেউ স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা রূপে গন্য হবে না, ভোটার ও নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে না, জমি জমা চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে, এসব কি যুক্তিসঙ্গত আইন? বাঙ্গালী আর উপজাতিদের জন্য এরূপ বাধা নিষেধ ও সীমাবদ্ধতা তো দেশের কোথাও নেই। চীফদের পদ ও ক্ষমতা গণতান্ত্রিক নয়। তারা জনপ্রতিনিধিও নন। রাজতন্ত্র ছাড়া, এরূপ কর্তৃত্বমূলক পদও ক্ষমতা কি কোন স্বাধীন দেশে প্রাপ্য? তা না হলে তাদের ক্ষমতার উৎস কী? বাংলাদেশ সংবিধানের অতিরিক্ত কোন অলিখিত বা গোপন সংবিধান আছে কি. যেটি উপজাতীয় চীফদের নির্বাহী ক্ষমতা অনুমোদন করে, অথবা তাদের রাজ ক্ষমতার স্বীকৃতি দান করে? হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলেও তাদের অনুরূপ কোন ক্ষমতা লিপিবদ্ধ নেই, যে আইন পরাধীন আমলের উচ্ছিষ্ট। উপজাতিরাও আজকাল চীফদের প্রাধান্য দেয় না। জুমিয়ারাও তাদের উদ্দেশ্যে ভীড় জমায় না। তাই পূন্যাহ অনুষ্ঠান চাকমা ও মাং দরবারে অনুষ্ঠিত হয় না। কেবল অতি কষ্টে বোমাং প্রধানরা এই অনুষ্ঠানটি কোন মতে জিইয়ে রেখেছেন। পরিবর্তে আরেক রাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, আর তা হলো স্থানীয় কাউন্সিল বা পরিষদ ভিত্তিক ক্ষমতা। সেই ১৯৮৯ সালে তিন জেলা পরিষদ ভোটারহীন নির্বাচনের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে, গত দীর্ঘ দিন যাবৎ বহাল আছে। এখন আঞ্চলিক পরিষদ নামে, আরেক বড় পরিষদ মনোনীত হয়ে ক্ষমতাসীন। তারও কোন নির্বাচন হওয়া অনিশ্চিত। এটা হলো স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা ভোগের কায়েমী ঘাপলা।

৪। ব্যাপক সংখ্যক প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়র ও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছে।

৫। শিক্ষাগত উচ্চ যোগ্যতার বলে, প্রধান তিন সম্প্রদায় চাকমা মারমা ও ত্রিপুরাদের কর্ম সংস্থানের হারও বেশি। কোটা ও সরকারী আনুকুল্যে তারা সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্ত লোক। এরশাদ আমলে কর্ম সংস্থান ও নিযুক্তি বন্ধ থাকা সত্বেও সরকার ও স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষের আনুকুল্যে বিভিন্ন সংস্থার লোভনীয় পদে, কোন পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা ছাড়াই ১৮০০ উপজাতীয় যুবক যুবতীর কর্ম সংস্থান হয়েছে। স্থানীয় পরিষদ ও উন্নয়ন বোর্ডেও অনেকের নিযুক্তি ঘটেছে। এই নিয়ম বহির্ভূত আনুকূল্যের লক্ষ্য হলোঃ তাদের মন জয় করা ও বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান থেকে বিরত রাখা। অথচ বাস্তবে তার কিছুই হয়নি।

(তাং-রোববার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ৩০ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম মূলতঃ খাস পাহাড় ও বনাঞ্চলের সমষ্টি। জনবসতি অঞ্চল রূপে এটি কখনো বিবেচিত ছিলো না। মোগল আমলে এখানে জুম নোয়াবাদ নামীয় এক অস্থায়ী বন্দোবস্তি ব্যবস্থার আওতায়, পূর্ব সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলবাসী কুকি নামীয় উপজাতীয় জুমিয়াদের, বর্ষা মওসুমে কিছু এলাকায়, কার্পাস তুলা চাষ ও সরবরাহের শর্তে, জুম চাষ করতে দেওয়া হতো। চাষ ও ফসল কাটা শেষে তারা নিজেদের মুক্তাঞ্চলে ফিরৎ চলে যেতো। তখন বর্তমান উপজাতিদের কারোরই আগমন ও অধিবাস গড়ে উঠেনি। বন সম্পদের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে তা সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনও ছিল না। বরং আবাদ ও বসতি বৃদ্ধির প্রতি সরকারের আগ্রহ বেশি ছিলো এবং তাই ছিলো রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সূত্র। তবে বসতিহীনতার এক পর্যায়ে বৃটিশ আমল এসে যায় এবং তখন আরাকানে, চাকমা ও মগ সম্প্রদায়ের পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষ ঘটে। যদ্দরুণ নির্যাতিত চাকমা সম্প্রদায় আরাকানে ত্যাগ করে বাংলাদেশী সীমান্ত ভূক্ত বন ও পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পরে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান বিজিত হলে, স্থানীয় প্রতিবাদী মগেরাও দেশ ত্যাগ করে, এ পারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ আরাকানী উদ্বাস্তু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত বৃটিশ কর্মকর্তা মিঃ ম্লিরিল কক্স, এখনো শহর কক্সবাজার নামের ভিতর স্মৃতি হয়ে আছেন।

পরে শরণার্থী চাকমা ও মগদের সাথে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় লোকেরা এসে যোগদান করে। বন পাহাড় সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন না থাকায়, বিপুল সংখ্যক শরণার্থী জুমজীবি উপজাতিদের অবাধে বসতি স্থাপন ও জুম চাষের দ্বারা জীবিকা সংগ্রহে উৎসাহিত করা হয়। তারা বার্মার বিরুদ্ধে বৃটিশ সহযোগী যোদ্ধা রূপেও মূল্যায়িত হয়,যদ্দরুণ সহজে অভিবাসীর মর্যাদা লাভ করে। পরে বন ও পাহাড় মূল্যবান ও সমৃদ্ধ রাজস্ব সুত্র রূপে প্রতিভাত হলে ১৮৬৫ সালে আইন নং ৭ ধারা নং ২ জারি ও তা ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ সালে কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সমূদয় অঞ্চলকেই বনরূপে ঘোষণা দান করেন। পরবর্তীতে ১২২০.৯৬ বর্গমাইল অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং ৩১৬৬ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত হয় অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল বা ইউ এস

এফ। অবশিষ্ট ৬৯৬.০৪ বর্গমাইল মাত্র বসতি বা আবাদী অঞ্চল রূপে স্বীকৃতি পায়, যার ২৫৬ বর্গমাইল এলাকা পরে কর্ণফূলী হ্রদের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। এবার শুভঙ্করের ফাঁকি এটাই যে ৩১৬৬ বর্গমাইল ব্যাপ্ত অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলটি, এখন বসতিমুক্ত নেই। এখন এটি বিভিন্ন মৌজাধীন অঞ্চল ও জুম ক্ষেত্র, যার তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ হলেন তিন উপজাতীয় সর্দার ও তিনশত তেয়াত্তর জন মৌজা প্রধান বা হেডম্যান, যারা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত। তারা সরকারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তিকে অবজ্ঞা করে এটাকেই বলেনঃ উপজাতীয় ভূমি অধিকার। সরকারের উদার আচরণের ভীষণ কুফল হলোঃ তারা অবাধে খাস পাহাড় ও বনের প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগ ব্যবহারের নিজস্ব বাণিজ্যিকরণ ও ধ্বংস সাধনে লিপ্ত। জুমের দ্বারা বন, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কাজটি বেআইনী হলেও তা কখনো আমলে নেওয়া হয় নি। এখন সংগঠিত উপজাতীয় শক্তি এমনই বেয়াড়া যে অপমান, বদলী ও প্রাণের ভয়ে, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বাহিনী সদস্যরা সর্বদা তটস্থ থাকেন। জোতের পারমিটের নামে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মূল্যবান কাঠ সম্পদ আহরিত হচ্ছে আর বিনা শুল্কে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল তো উপজাতিদের সামাজিক জোতভূক্ত বাগানেই পরিণত হয়ে গেছে। তার গাছ, বাঁশ, বল্লি, জ্বালানী কাঠ, বেত, ছন, লতা, পাতা ইত্যাদি অবাধে আহরিত হয় ও বাজার হাটে প্রকাশ্যে বিকোয়। সরকার এগুলোর শুল্ক লাভ থেকেও বঞ্চিত। অবাধ গৃহস্থালী ব্যবহারের অধিকারের মানে তো খরিদ বিক্রি ও বাণিজ্য করা নয়। এগুলোকে পণ্য অনুদান ধরা হলে, প্রতি উপজাতীয় পরিবার বার্ষিক লক্ষাধিক টাকার আর্থিক সুবিধা ভোগ করে থাকেন, যা দৃশ্যতঃ অনুদান বলে অনুভূত নয়।

বৈষয়িক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার অতিরিক্ত এই মূল্যবান আনুকুল্য অবহেলা যোগ্য নয়। তজ্জন্য তাদের মাঝে স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকাটাও বিস্ময়কর।

৭। সরকারী অর্থে পরিচালিত উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা পরিষদগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও, তাতে দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলো পর্যন্ত সড়ক ও নৌ যোগাযোগে সমৃদ্ধ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণ কাজের ব্যাপকতা সর্বত্রই দৃশ্যমান। স্কুল, কলেজ, বৌদ্ধ মন্দির, কমিউনিটি সেন্টার, পালি টোল, সেচ নালা, বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ, কারিগরী ও শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খেলার মাঠ, টিউবওয়েল, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, সিড়িঁঘাট, বাজার হাট ইত্যাদির উন্নয়ন ও নির্মানে এই সংস্থাগুলো অত্যন্ত তৎপর। উন্নয়ন ক্ষেত্রের অভাবে ভবিষ্যতে হয়তো ব্যক্তিগত ঘর বাড়ি নির্মান, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া, বিনিয়োগ সহায়তা দান ইত্যাদির উদ্যোগের প্রতিও এ প্রতিষ্ঠানগুলো এগুবে। লক্ষ্য হবে ব্যাপক জনকল্যাণ ও জীবন মানের উন্নয়ন।

এই গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অবশ্য যোগ্য ও সেবা ধর্মী নেতৃত্বের উপস্থিতি আবশ্যক, নতুবা এগুলো হয়ে যেতে পারে অপব্যয়ের ক্ষেত্র ও লুটপাটের আখড়া। ক্ষমতার পাদ পীঠে, স্বার্থান্ধ লোকের আগমন অবশ্যই ঘটে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হয় মাল পানি কামান ও আখের গোছান। তা না হয়ে উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ

সমূহের মাধ্যমে যে বিপুল অংকের উন্নয়ন বিনিয়োগ হয়েছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার হলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চেহারা আরো সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হতো। গরীব দেশের টাকা, ততোধিক গরীব অঞ্চলের ভাগ্যোন্নয়নে যথাযথভাবে ব্যয়িত না হওয়া, এবং চাটার দলের পেটে যাওয়া, বড়ই দূর্ভাগ্যের বিষয়। অনেকে খেদ করে বলেনঃ পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে যত টাকা ব্যয় হয়েছে, তাতে কর্ণফুলী হ্রদ ও ভরে যেতো। অথচ উন্নয়ন তত দৃশ্যমান নয়। অধিকাংশ চাটার দলের পেটে গেছে। কেউ করেছে ছিনতাই ও চাঁদাবাজী। কেউ বসিয়েছে ভাগ। ঘুষ, কমিশন, সালামী তো আছেই। এই চাটার দলে পাহাড়ী অপাহাড়ী সবাই যুক্ত।

৮। আরেক রাহাজানি ব্যবস্থা সামনে অগ্রসরমান। সে হলো উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ীর নামে অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণবাদ। বাঙ্গালীদের বঞ্চিত করে সব পাওয়ার পায়তারা। আইন হয়ে গেছে। এখন বাস্তবায়ন চলছে। পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদ, টাস্কফোর্স, উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ, পার্বত্য বাঙ্গালীদের জন্য নিষিদ্ধ। এর কোন মিয়াদকাল নেই। এটি কায়েমী ব্যবস্থা। পরিষদ সমূহে নির্বাহী কর্মকর্তাদের পদ ও অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিযুক্তিতেও অবাঙ্গালীদের অগ্রাধিকার। অন্য স্থানীয় কর্মসংস্থান, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি বন্দোবস্ত, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদিতেও বাঙ্গালীরা উচ্ছিষ্টের ভাগীদার। দেশ ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ, বৃত্তি ও নিযুক্তির ক্ষেত্রেও উপজাতীয় বৃহৎ কোটা ও অগ্রাধিকার নির্ধারিত। পার্বত্য বাঙ্গালীরা এসবে বৈষম্যের শিকার। অথচ দেশের সর্বাধিক অনুন্নত ও পশ্চাদপদ সমাজ হলো এই পার্বত্য বাঙ্গালীরা। বৃহৎ তিন উপজাতি সম্প্রদায়, অবশিষ্ট ক্ষুদ্র উপজাতিদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাকেও শোষণ ও ছিনতাই করে ভোগ করছে। সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোগ ও ভাগের সুনির্দিষ্ট সময় পরিমাণ ও পরিমাপের উল্লেখ না থাকায়, সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও তারতম্য ঘটছে। এ ক্ষেত্রে সময়সীমা, মাপকাঠি ও হ্রাস বৃদ্ধি ধরণের বিধি ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিলো।

পরিশেষে স্মর্তব্য যে, বিপুল সুযোগ সুবিধা দান সত্বেও তা উপজাতীয় সন্তুষ্টি বিধানে ব্যর্থ হয়েছে। এসবই বর্ধিত ক্ষমতা ও স্বাধিকার লাভের অগ্রাভিযানে শক্তি বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

(তাং-শনিবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ৫ জুন ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

৯। কারিগরী ও উচ্চ শিক্ষার সংরক্ষিত আসন বা কোটার সুযোগে প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ প্রফেসার, ডাক্তার, উচ্চ প্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি পর্যায়ে শতাধিক যোগ্য ব্যক্তি দেশী বিদেশী বিশ্ব বিদ্যালয় ও বিশেষায়িত শিক্ষায়তন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, উপজাতি সমাজের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও মুখ উজ্জ্বল করছেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই, উপজাতি সমাজ বাংলাদেশের শিরোমনি হয়ে দাঁড়াবেন। লেখা পড়ার শীর্ষ যোগ্যতা, তাদের হাতে এনে দিবে, সম্পদ সম্পত্তি, শীর্ষ পদ ও ক্ষমতা। এখনই সারা দেশের অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষক রূপে উপজাতিরা আনুপাতিক হারের চেয়ে অধিক সংখ্যায় গিজ গিজ করছেন। এখন তারা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী নন, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পিছিয়ে

পড়া এলাকা নয়। গোটা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে বহুগুণ অধিক অভাগা বাঙ্গালী, বাংলাদেশের যে কোন বড় শহরের বস্তিতেই মানবেতর জীবন যাপন করে। এই গরীব দেশের এটা স্বাভাবিক চিত্র। তবু উপজাতীয় ভাগ্যোন্নয়নে বাংলাদেশ সচেষ্ট। এ কারণে এতদাঞ্চলে এখন বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের আদিম জীবন মান ও পশ্চাদপদতা কেটে ওঠেছে। এ জন্য বাংলাদেশ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলোঃ উপকৃতরা মোটেও কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট নন। তাদের খাই ও দাবী অত্যধিক। এখনো বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের দায়ভার বাংলাদেশর উপর আরোপিত হয়। উপকার ও উন্নয়নের বিপরীতে উপজাতিদের কিছুই যেন করার নেই। এতদাঞ্চলের বাংলাদেশ হয়ে থাকা যেন অন্যায় ও অপরাধ, অথবা উপজাতিদের বাংলাদেশী হয়ে থাকা যেন এক মস্ত অবদান। এর প্রতিদান হিসাবে তাদের অলস ভোক্তা হয়ে থাকা, নিরেট মেহেরবানী। পদ, সম্পদ, ক্ষমতা, অনুদান লাভ, সে তো তাদের প্রাপ্য।

১০। উপজাতীয় ক্ষমতায়ন ও আনুকুল্যের বিপরীতে জাতি বৈষম্যের শিকার, এবং রাষ্ট্রীয় এক কেন্দ্রিকতা বিপন্ন। গণতান্ত্রিক আর অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় নীতি এখন আর অক্ষুণ্ন নেই।

বিশেষ আইন ও ক্ষমতার ধারায়, পর্বতাঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের জন্ম তা স্থানীয় শাসন জাত, না রাজনৈতিক রূপান্তর, এই প্রশ্নটি ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ রাষ্ট্র ফেডারেল নয়, এক কেন্দ্রিক। এই চরিত্রকে বজায় রেখে, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের উপায় হলো, প্রশাসনিক ইউনিটগুলোতে, অভিন্ন আইনের আওতায় স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে তা-ই ব্যক্ত আছে। কিন্তু কর্তৃত্বের ধারা ব্যবস্থায় পরিষ্কার নয় যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ অনুরূপ স্থানীয় শাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কিনা। ফেকড়া হলোঃ পার্বত্য পরিষদ আইন, সারা দেশের উপযোগী অভিন্ন স্থানীয় শাসন বিধি নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় আইন প্রবর্তিত হয়ে, বিধিগত বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে, যার পরিনামে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বিরোধী উদাহরণ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। এই বিপদকে টেনে আনা যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ বলা সঙ্গত যে, বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ হলো বাংলাদেশের পক্ষে বৈষশ্য মূলক রাজনৈতিক বিষফোড়া বিশেষ।

১১। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী, তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণের পক্ষে জনগণ কর্তৃক জন সমর্থনের ভিত্তিতে, এর শাসন প্রশাসন আইন ও নীতি নির্ধারণ সম্পন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন প্রশাসন আইন ও নীতি নির্দেশে এই মৌলিকতা পালিত হচ্ছে না। সরকার ৫০% এর বেশী জন সমর্থনের দ্বারা গঠিত নয়। এই ত্রুটির ক্ষতি পূরণ রূপে তার উচিতঃ নীতি নির্দেশের পক্ষে জনমত ও সমর্থন নিশ্চিত করা। এই আনুষ্ঠানিকতার প্রথম ধাপ হলো, জাতীয় সংসদের সমর্থন গ্রহণ, ও তৎপর গণভোটের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক জাতীয় সংকট ও সমস্যার নিরসনে সরকারের

পদক্ষেপের পক্ষে এরূপ জনসমর্থন গ্রহণ করা হলেই দেশ হবে সত্যিকার গণপ্রজাতন্ত্রী। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সরকার এক নায়ক সুলভ ব্যবস্থা নিয়ে অগ্রসরমান। জাতি এই প্রশ্নে দ্বিধা বিভক্ত ও সন্দিহান। এখানে এক নায়ক সুলভ পদক্ষেপ গ্রহণ যথার্থ নয়। গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ও আদর্শের গুরুতর ব্যত্যয় এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট।

রাষ্ট্রীয় মৌলিক আইন সংবিধানে, বিশেষ কোন অঞ্চল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত করা অনুমোদিত নয়। অনুচ্ছেদ ১৯, ২৭ ও ২৯ মানুষে মানুষে আর অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্য অনুমোদন করেনা, এবং সবার জন্য ন্যায় বিচার ও সমতারই নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু পার্বত্য আইনে, স্থানীয় বাঙ্গালীদের জন্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে চেয়ারম্যান পদ লাভ নিষিদ্ধ। তারা স্থানীয় জনসংখ্যায় প্রায় অর্ধেক হলেও, ঐ পরিষদ সমূহের ১/৩ সদস্য পদের অধিকারী। কর্মসংস্থান, নিযুক্তি ও আর্থিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে, পরিষদ আইনে উপজাতি বা অবাঙ্গালীদেরই অগ্রাধিকার প্রাপ্য। পার্বত্য মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী পদ, দুই পরিষদ, উন্নয়ন বোর্ড ও টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদ উপজাতি কোটা ভূক্ত সংরক্ষিত। ভোটার হওয়ার সাংবিধানিক যোগ্যতা ও বাঙ্গালীদের জন্য শর্ত সাপেক্ষ। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা-হওয়ার সার্টিফিকেটটি ও তাদেরকে উপজাতীয় চীফদের নিকট থেকে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ এ বাঙ্গালীরাই বাংলাদেশ ভূখন্ডের আদি বাসিন্দা, স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা। উপজাতিরা বহিরাগত অভিবাসী অথবা তাদের বংশধর। ভাগ্যের পরিহাস এটাই যে, যারা এ দেশের আদিবাসিন্দা নয়, তাদেরই দাবী অনুযায়ী সরকার ও ভাবেনঃ স্থানীয় বাঙ্গালীদের অধিকাংশ বহিরাগত আর উপজাতিরাই স্থানীয় আদি অধিবাসী। তাতে ভাবার অবকাশ থাকে যে বাঙ্গালীরা জাতীয় প্রধান জনগোষ্ঠী রূপে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার হকদার। এ নিয়ে বিতর্ক অনাকাঙ্খিত। এর প্রতিকারে স্থানীয় অস্থানীয়, আদি ও বসতি স্থাপনকারী পরাগত বহিরাগত ইত্যাদি ভাবার সব সূত্র সম্বন্ধ পরিহার করা দরকার। এর পক্ষে সংশোধনী হবেঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও বসতি সমৃদ্ধ উপজাতি ও বাঙ্গালী অধ্যুষিত মিশ্র অঞ্চল। স্থানীয় বাসিন্দা ও সম্প্রদায় পরিচিতির সনদ দিবেন স্থানীয় জেলা প্রশাসক। জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা লাভের সুত্র হবে গণতান্ত্রিক অবাধ নির্বাচন। সাংবিধানিক ভোটাধিকারই প্রযোজ্য হবে। সামন্তবাদ, মনোনয়ন ও ঔপনিবেসিক আইনঃ হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের স্থান গ্রহণ করবে, দেশে প্রচলিত অভিন্ন বিধি ব্যবস্থা ও সংবিধান। ভূমি প্রশাসনের দায়িত্ব রাজস্ব বিভাগ ও তহসীলের উপর ন্যস্ত হবে। প্রথাগত নিযুক্তি, শাসন প্রশাসন ক্ষমতা, ও ভোগ দখলের বিধি ব্যবস্থা রহিত হবে। এক সাথে উপজাতীয় সার্কেল ও নির্বাচিত সংস্থা পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে নির্বাচিত আর মনোনীত *রাজা,* চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের অবস্থান মাথাভারি ব্যবস্থা। এতে ছাটাই বাছাই হওয়া দরকার। এবং তন্মধ্যে প্রথাগতভাবে নিযুক্ত চীফ, হেডম্যান ও কারবারীদের পদ ও দায়িত্ব সর্বাগ্রে বিলোপযোগ্য। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলটিও এখন আমল যোগ্য নয়। সর্বোপরি পার্বত্য মন্ত্রণালয় উপজাতীয় মন্ত্রী পদ ও চেয়ারম্যান পদ সমূহ বাড়তি তোষণ ও পক্ষপাত মূলক ব্যবস্থা। এসব পরিত্যজ্য।

পার্বত্য সংকটের সমাধান সুপারিশ

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় অধিবাসীদের ব্যাপারাদি সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে না। এ সংক্রান্ত প্রথম ভুল হলো ঃ এই অবাঙ্গালী লোকজনকে স্থানীয় আদি স্থায়ী অধিবাসী রূপে জ্ঞান করা হয়, এবং এতদাঞ্চলকেও মনে করা হয় অবাঙ্গালী অঞ্চল। এটাই স্থানীয় তথ্য রূপে রাজনীতি বিজ্ঞানের শক্ত ভিত্তি হয়ে এতাদাঞ্চলীয় সমস্যা সংকটের পরিপোষন করছে। নৃবিজ্ঞান মতে ও স্থানীয় উপজাতীয়রা বাঙ্গালী নয়, পৃথক এক জাতিসত্তা, যারা নিজেদের এই আবাসস্থলে বহিরাগত সংখ্যাগুরু এবং এখানে তারা স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। নিজেদের আধিপত্য ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ বিরোধী।

কোন জাতির অধিকারগত মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে তাকে কখনো কোথাও দমান যায়নি। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক আমলের পরে আজকাল এমনটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানবধিকার মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের নামে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সর্বত্র সবার কাছে সমর্থিত। তবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য এবং উচ্চাভিলাষের দ্বারা কোন অঞ্চল গ্রাস ও কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দ্বারা মানবিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তিকে বিঘ্নিত করা আকাঙ্খিত নয়। আত্মরক্ষার এ পথটি এখনো অবারিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিপক্ষে বাংলাদেশ এখন অবরুদ্ধ। এ ব্যাপারে চুক্তি ও বিধিবিধান হয়েছে ঃ এতদাঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এখানে তাদের কিছু অগ্রাধিকার প্রাপ্য, কিছু উচ্চপদ তাদের জন্য সংরক্ষিত। বাঙ্গালীদের অবাধ ভূম্যাধিকার, ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধিত্ব এখানে নিয়ন্ত্রিত।

এই স্বীকৃতি ও চুক্তি হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পথে মূল্যবান অগ্রগতি, যা বিশ্ব সমাজের কাছে অঙ্গিকার বিশেষ। সোজাসুজি এর ভিন্নতা করার উপায় নেই। বিশ্ব সমাজ কর্তৃক বাংলাদেশকে উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দানে বাধ্য করার পক্ষে এটি এক মাইলফলক। পার্বত্য চুক্তি ভঙ্গ করা হলে, বাংলাদেশকে শান্তি ভঙ্গ, অধিকার হরণ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে।

উপজাতিদের নিত্যদিনের রাজনৈতিক কৌশল অভিনব। চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত মন্ত্রী, এমপি, রাজা, চেয়ারম্যান পদ উচ্চ বেতন ভাতা, গাড়ীবাড়ি বিলাসী সুবিধার কিছুই যথেষ্ট নয়। এগুলো এ পর্যন্ত তাদের সন্তুষ্ট করেনি। এ পথে উপজাতীয় পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা কামনা বাস্তব নয়। আসলে তারা উচ্চাভিলাষী বহিরাগত বংশোদ্ভূত লোক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তারা আগ্রহী নয়। এদের পালন পোষন ও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দান বিড়ম্বনাকর। সর্বোপরি

এরা বাংলাদেশের মূল নাগরিক বাঙ্গালীদের ও দেশের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে এতদাঞ্চলে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়।

স্থানীয় সরকারি প্রশাসন আর প্রতিরক্ষাকেও উপজাতীয় করণে তারা উদ্বুদ্ধ। এসবই ধৃষ্টতাপূর্ণ রাজনৈতিক উচ্ছাকাঙ্খা। এই বাড়াবাড়ি অসহনীয়। এতে তাদের সহ দেশ ও জাতির এক হয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই। বৃটিশ আমলে এদের পূর্বপুরুষেরা এতদাঞ্চলে উদ্বাস্তু রূপে এসেছিলো। ঐ বৃটিশরাই তাদের হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলভূক্ত অভিবাসন আইন ৫২ বলে বাংলাদেশবাসীর অনুমোদন ছাড়াই এতদাঞ্চলে স্থান দিয়েছে। এখনো তারা চরিত্রে মননে বিদেশী ও বিজাতীয় থেকে গেছে। তারা বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী স্বজন হতে পারেনি। এদের মাঝে সর্বাধিক উগ্র অবাধ্য আর বৈরী সম্প্রদায় হলো চাকমারা। এরা দেশ দ্রোহে অন্যান্য সহযোগীদের প্ররোচনা দাতা গুরু।

উপজাতীয়দের দুর্বল রাজনৈতিক ভিত্তি হলো তারা বৃটিশ আমলের বহিরাগত অভিবাসী জন গোষ্ঠী, প্রশ্নাতীত ভাবে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা নয়। তাদের অভিবাসন এদেশবাসীর দ্বারা অনুমোদিত নয়। ১৯৭২ সালে অবাধ্যতার কারণে পাকিস্তান প্রদত্ত বিহারী অভিবাসন বাতিল হয়েছে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০/১ রেগুলেশন ভুক্ত ৫২ নম্বর অভিবাসন আইনটিও কার্যকর নেই। যেহেতু এই উভয় সম্প্রদায়ই দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে দেশকে বিচ্ছিন্ন আর অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাদান ও চুক্তি করা সত্ত্বেও বৈরী উপজাতীয়রা দেশের মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের বিতাড়নে এখনও সক্রিয় আছে। সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজী অব্যাহত রেখেছে। সেহেতু এই ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার শাস্তি হওয়া অন্যায় কিছু নয়। অস্ত্রবাজি গণহত্যা আর বাঙ্গালী প্রত্যাহারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এমন এক গুরুতর অপরাধ যার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও জাতি কর্তৃক তারা বৈরী ঘোষিত হতে পারে। তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কর্মসংস্থান রহিত, অভিবাসন ও নাগরিক অধিকার বাতিল হওয়া অন্যায় কিছু নয়।

এমন দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধের উপায় হলো : তাদের অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তৎপর আনুগত্যের প্রমাণ দেয়া, যাতে মানবতাবাদী সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর করা সম্ভব হয়। দেশ বৈরী এই অভিযুক্তদের বিদেশী শক্তির কাছে এমন সুযোগ লাভের জন্য তদবিরে সক্রিয় হওয়া ও সুফল লাভের অপেক্ষা করাটাও অপরাধ। বিদেশী মুরব্বী রাষ্ট্রসমূহ তাদের পক্ষে এসে হস্ত ক্ষেপ করবে, এই আশাবাদ ধৃষ্টতা।

বিহারী আর পার্বত্য বিদ্রোহী উপজাতীয়রা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বৈরীরূপে তাদেরকে পালন পোষণের কোনো সুযোগ নেই। অপরাধবোধ, দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনাতেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্র নিহিত। তাছাড়া তাদেরকে নাগরিক রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে অপরাধে অভিবাসী বিহারীরা দুর্ভাগ্যজনক শিবির জীবনযাপনে এখন বাধ্য, তার চেয়ে অধিক গুরুতর অপরাধে দ্বিতীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠী উপজাতীয়রা সমান শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তবে ক্ষমা ও মানবিক সেবা তাদের প্রাপ্য। সে জন্য তাদেরকে অপরাধবোধ দোষ স্বীকার ক্ষমা প্রার্থনা ও আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হতে হবে। কোন ক্রমেই অযাচিতে ক্ষমা আর সুবিধাবাদ মঞ্জুরযোগ্য নয়।

পার্বত্য চুক্তি একটি বিরাট উদারতা, উপজাতীয়রা যার অপব্যবহার করছে, বাংলাদেশ তার অসহায় অনুকারক। এর নেতিবাচক প্রভাব অবশ্য বিবেচ্য। চুক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গিকার হলো বাংলাদেশ সংবিধান অনুসরণ। অথচ প্রথম দফাতেই তা লঙ্ঘনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই লঙ্ঘনকে উভয় পক্ষের কেউই আমলে আনছেন না। তাতে চলমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতেই সব অসাংবিধানিক চুক্তি বিধিবিধান ক্রিয়া প্রক্রিয়া আপনা আপনি রহিত ও বাতিল হয়ে গেছে, যথা ঃ অনুচ্ছেদ নং-৭ (১) ও (২), ২৬ (১) ও (২)। চুক্তিতে সংবিধান আর অলঙ্ঘনীয় অন্যান্য মৌলিক অধিকার আইনগুলো পর্যন্ত অক্ষুণ্ন নেই। রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র বিধৃত ধারা নং-১ এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত ধারা নং-৫৯ চুক্তি ভুক্ত আইনে বিকৃত হয়েছে। অথচ কোন কর্তৃপক্ষই এরূপ করার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত নন। এটি যথেচ্ছাচার।

মনে হয় ক্ষমতার শীর্ষাসীন ব্যক্তিরা পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয়দের নিয়ে বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এ অবাঙ্গালীরা অস্থানীয় না স্থানীয়, দেশীয় নাগরিক না বিদেশী বংশোদ্ভুত, এ ব্যাপারে তাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। তাই তাদের দ্বারা বৈরী উপজাতীয়দের নিয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে না।

এমনটি হওয়ার মূল কারণ ধরণা ও তথ্যগত অজ্ঞতা অবশ্যই। উপজাতীয়দের ধারণা ও কার্যক্রম চরমপন্থী। তারা পার্বত্য অঞ্চলকে বাঙ্গালী মুক্ত আর নিজেদের প্রশাসিত রাজ্যে পরিণত করতেই আগ্রহী। বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা মোতায়েনকেও তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ভাবে। জনপ্রাধান্য ও বর্ধিত সুযোগ সুবিধা বলে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পথেই তারা অগ্রসরমান। এই এলাকা চিরকালীন বাংলা অঞ্চল, যার আদি অধিবাসী হলো চট্টগ্রামী মূলের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী। দুর্গম পাহাড় ও বনাঞ্চল এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চল থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। সরকারও এতদাঞ্চলকে জাতীয় বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করে এতদাঞ্চলকে করে রেখেছে জনবসতি মুক্ত। এই সুযোগে সীমান্ত দেশীয় জুমজীবী উপজাতীয় লোকেরা কেবল বর্ষাকালে ভ্রাম্যমান জুম কৃষিতে এতাদঞ্চলে নিয়োজিত হতো এবং পরে ফেরতও চলে যেত। তারা ছিল বহিরাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। এখনো তাদের মূল জাতি ত্রিপুরা মিজরাম ও আরাকান অঞ্চলের স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বসবাস করছে এবং ঐ তিন এলাকাই তাদের চিরকালীন জাতীয় অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো তাদের একদল শরণার্থী লোকের অভিবাসিত এলাকা। এখনকার স্থানীয় উপজাতীয়রা ঐ শরণার্থীদেরই বংশধর। স্থানীয়ভাবে তাদের আদি ও স্থায়ী সংখ্যাগুরু হওয়ার দাবী সঠিক নয়। এই লোকজনদের পিতৃপুরুষদের আদি স্বদেশ ত্যাগ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ এবং পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন ১৯০০/১ এর অভিবাসন আইন নং-৫২ বলে এই অঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, যা এদেশবাসী কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সেই ঔপনিবেশিক দখল, শাসন ও বিধি ব্যবস্থার কোন স্থায়ীত্বও নেই। স্বাধীনতার পর সে পরিস্থিতিও বিদ্যমান নেই। নিজেদের স্থানীয় ক্ষমতা বলে সেই অতীত বিদি ব্যবস্থা বিলোপের অধিকার বাঙ্গালীদের অবশ্যই আছে। এখানে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য হলো সংশ্লিষ্ট লোকজনের শান্তি অনুসরণ না করা, আনুগত্য হীনতা অবলম্বন, মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জ করা, এগুলো কোনো মতেই

অবহেলা যোগ্য নয়। নতুবা তাদের পক্ষে বাঙ্গালী মন জয় করা অসম্ভব হতো না। এমনটি করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিলো। নিজেদের সে কর্মফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বাঙ্গালী মানেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র। বাংলাদেশী জাতি তথা বাঙ্গালী ছাড়া এ দেশ ও জাতি কল্পনীয় নয়। এই নাম বিধৃত লোক সত্তা ও পরিবেশই এই দেশের জাতি শক্তি ও অস্তিত্বের ভিত্তি। এই মৌলিকত্বের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থাকা প্রশ্নাতীত। খাঁটি বাংলাদেশী হওয়ার উপায় এই আস্থা ও আনুগত্যের প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত হওয়া। এই সন্দেহটি মূলতঃ অতীত ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত, যা এ পর্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত পর্যালোচিত ও অধিত হয়নি। এই তথ্য শূন্যতাকে দখল করে নিয়েছে কিছু আজগৌবী উপজাতীয় কথা কাহিনী, রূপকথা ও বানোয়াট গাল গল্প, যার বক্তব্য হলো উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের তিন রাজ পরিবার মূলত তিন স্থানীয় শাসক, বাঙ্গালীরা এখানকার স্থায়ী আদি বাসিন্দা নয় বহিরাগত। উপজাতীয়রা সরল নিরীহ বিধায় বাঙ্গালীদের দ্বারা ঘোষিত আর নির্যাতিত। তারা আত্মরক্ষার্থেই অস্ত্র ধারণে বাধ্য হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, নিজেদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা। এর লক্ষ্য অবাধে বাঙ্গালী উচ্ছেদ নয়।

এখানে এ প্রশ্নগুলোর যথার্থতা যাচাই হওয়া আবশ্যক। নয়তো বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীরা অপরাধী হয়ে থাকবে। প্রকৃত পক্ষে নির্দোষ ও নিরপরাধ কে? বাঙ্গালী বাংলাদেশ না উপজাতীয়রা? এ প্রশ্নে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত বিভ্রান্তিকে তাত্ত্বিকভাবেই কাটান জরুরী। দেশবাসী সাধারণ লোকতো বটেই, জ্ঞানী গুণীদের বিপুল সংখ্যক লোক পর্যন্ত এই প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত নন। বিদেশীরাও এই বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এই লোকজনদের ধারণা : স্থানীয় সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতি সত্তা সমূহ স্থানীয়ভাবে শান্তিতে নেই। বাংলাদেশে তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারে ঘাটতি আছে। যে জন্য তারা অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ। তারা প্রকৃতই বাংলাদেশী তবে অধিকার বঞ্চিত সংখ্যা লঘু। এদের পৃষ্ঠপোষণ দরকার।

এ কারণেই উপজাতীয় সংখ্যালঘু প্রশ্নে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চাপাধীন আছে। সুতরাং তাকে তথ্যগতভাবে আগে দেশে বিদেশে দায়মুক্ত হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয় লোক সংক্রান্ত তথ্যচর্চার ব্যাপারে বাংলাদেশ উদাসীন। তাকে প্রমাণ করতে হবে এই লোকজনেরা বৃটিশ আমলেরই বহিরাগত শরণার্থী বংশধর, স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ১৯০০ সালের পরে রচিত ও জারীকৃত পার্বত্য শাসন আইনের ৫২ ধারাই তাদের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণের আইনী প্রমাণ, যে আইন দেশীয় নয়, ঔপনিবেশিক।

ঔপনিবেশিক দখল ও রাজ্য বিস্তার, বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল ও লোক বিতাড়ণ, দক্ষিণ পূর্ব বাংলা অঞ্চল চট্টগ্রামে ঐ আরাকানী শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচ্য। ঐ লোকগুলো লুসাই, ত্রিপুরা, চাকমা, মগ ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত। ঐ আগ্রাসন ও উদ্বাস্তু জনিত বিরোধ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বার্মার মধ্যকার ১৮২৪ সালে সংগঠিত যুদ্ধে পরিণত হয়। তাতে আরাকান ও আসাম, বৃটিশ দখলাধীন হয়। এবং বার্মা, আসাম, আরাকান ও বাংলা হয়ে যায় একক বৃটিশ শাসনাধীন উপনিবেশ, যার অধিবাসীরা বৃটিশ প্রজা। এই বৃটিশ প্রজা হওয়া সূত্রে ভারতীয় বর্মী আসামী আরাকানী বাঙ্গালী আদিবাসী উপজাতি ইত্যাদি পরিচয়ের মৌলিকত্ব

ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। পরে আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দেয়া হলেও, একক বৃটিশ শাসনের ঘোলাটে পরিস্থিতির অবসান ঘটেনি। বার্মা, আরাকান, আসাম ও বাংলাদেশ স্বতন্ত্র হলেও এসবের অধিবাসী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী অভিবাসন ত্যাগ করে স্বদেশে ফেরত যায়নি। এরই ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রিপুরা, লুসাই, আরাকানী, মগ, চাকমা, বার্মী ও ভারতীয়রা স্থায়ী হয়ে পড়েছে। এতদাঞ্চলে তারা সংখ্যা গুরুও বটে, যার ফলে তারা এখন স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীদার। তবে বাংলাদেশের প্রধান জাতি বাঙ্গালীদের বৈরী ভাবায় এ অধিকারগুলো তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য।

আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য স্বতস্ফুর্ত। স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক মিশ্র পরিচয়ের অবসান ঘটেছে। এমন বর্মী আদিবাসী, উপজাতি আসামী মগ, চাকমা, বাঙ্গালী ইত্যাদি স্বতন্ত্র পরিচয় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। লোকদের ভিন্ন অবস্থান ভিন্ন অঞ্চলে অনাকাঙ্খিত হওয়া শুরু হয়েছে। এই বিরূপ পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজেদের আমলেই বহিরাগত প্রীতি ভাজনদের অভিবাসনের ছত্রছায়া দান করেন এবং অনেককে আবাসন গড়ে দিয়ে যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম এরূপই এক বহিরাগত উপজাতীয় উপ-নিবেশ। উপজাতীয় রাজনৈতিক দাবীর কৃত্রিমতার ইতিহাস বার্মা আরাকান ও বৃটিশ দলিল পত্রের মাধ্যমে এখনো জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। এখানে ঐ অতীত ইতিহাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং বিদ্রোহী উপজাতিদের প্রকৃত ইতিহাস অবহেলা করা হয়েছে। অথচ বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুতর। উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি বাসিন্দা ও সংখ্যাগুরু মান্য হলে, এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, তাদের নিজেদের এই আবাস ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দুস্প্রাপ্য নয়। এই অঞ্চলে বাঙ্গালী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধে বাঙ্গালী বিতাড়ন ও নির্মুলকরণ আন্দোলন, তাই ঐ উপজাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারেরই অংশ। সুতরাং বিপদকে ঘনিয়ে তোলার পরিবর্তে উপজাতীয়দের দাবীকে হাল্কা করতে হবে। বাংলাদেশের অমোঘ অস্ত্র হলো ইতিহাস। তাতেই প্রমাণিত তারা বিদেশী বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠী। স্বশাসন স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য নয়। বিদ্রোহজনিত অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া তাদের রেহাই নেই। চুক্তি সম্পাদন নমনীয়তা প্রদর্শন ও বিভিন্ন অধিকার প্রদান বিরোধীয় বিষয় নয়। এগুলো নাগরিকদের প্রাপ্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। বিদ্রোহীরা তার সুবিধা পেতে পারে না।

উপজাতীয়রা চরমপন্থী। তাদের ৫ দফা দাবী নামার দফা নং ৩(১) ৪ক ও খ-তে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা গুরুতর আপত্তিকর ও ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং অনাকাঙ্খিত। এই উচ্চাকাঙ্খার বিষয়ে বাংলাদেশের নমনীয় হওয়া মানে নিজের সর্বনাশ সাধন। দাবীটি যে কী সর্বনাশা তা তার ভাষ্যেই বিধৃত, যথা :

"দাবী নং ৩(১) ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭ হইতে বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়ই বিভিন্ন স্থান ও গুচ্ছ গ্রামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া।

৪(ক) ঃ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বিডিআর) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনা নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

৪(খ) ঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধাবস্থা কিংবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনা বাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনা নিবাস স্থাপন না করা।

এই দাবীগুলো চরম বিদ্রোহাত্মক। একে পাকাপোক্ত করেছে সশস্ত্র কার্যক্রম। এই বিদ্রোহী অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে বুঝতে দেয়া উচিত : তাদের প্রাপ্য হলো চরম শাস্তি। প্রথমতঃ তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তার বিপণ্ন শিশুকালে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের প্রচুর প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটিয়ে তাদের স্বদেমের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়ণে সচেষ্ট। এবং সর্বেপরি তারা বিদেশগত অভিবাসী লোক, আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। এই ইতিহাসকে পাল্টে তারা এই অঞ্চলে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। সুতরাং তাদেরকে দমিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। এর বিকল্প হলো : তারা দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নতুবা তাদের জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত।

অবাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা, ধারণা ও তথ্যগতভাবে, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী বিরোধী। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার লক্ষ্য অর্জনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪টি সশস্ত্র বিদ্রোহ। তাদের প্রতি চরম উদারতা ও নমনীয়তার উদাহরণ হলো আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত পার্বত্য চুক্তি। তবু তারা তাতেও সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ বলা যায় না। সব দান, অনুদান, দয়া দাক্ষিণ্য, অগ্রাধিকার ও ক্ষমাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। বড় বড় গাড়ি বাড়ি, মাসোহারা বৃথাই বিলান হচ্ছে। এর অর্থ হলো বিষয়টির প্রতি রাষ্ট্রীয় ও বহিরদেশীয় মূল্যায়ন সঠিক নয়। উপজাতি সংক্রান্ত পূর্ব আশাবাদ ধ্যান ধারণা ও তথ্য ভিত্তি ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটাই সঠিক তথ্য যে, পার্বত্য উপজাতিরা স্থানীয় আদিবাসিন্দা নয়। ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটিশদের দ্বারা তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত, যথা হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০/১ ধারা নম্বর ৫২, এবং ব্রিটিশ বার্মা যুদ্ধ ১৮২৪ এর কার্যকারণ সমূহ। এখন ধারণা ও তথ্যগত ভুল সংশোধন আবশ্যক। তাহলেই উপজাতিসহ দুনিয়াবাসী প্রকৃত ভুলের ব্যাপারে সচকিত হবে, এবং এ ধারণাও জন্ম নিবে যে উপজাতিদের রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের স্থানীয় সংখ্যা প্রাধান্য উদ্বাস্তু সমস্যাজাত কৃত্রিম। বাংলা রাষ্ট্র পক্ষের দুর্ভাগ্য যে সঠিকভাবে উপজাতীয় অতীত সন্ধান করা হচ্ছে না। এর ভিতর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক গিরিদর্পণ ভিত্তিক কিছু ধারাবাহিক তথ্যালোচনা, যার লেখক এই অভাগা ব্যক্তি, যিনি অশেষ দুঃখ কষ্ট অনুসন্ধান ও অভাব অসুবিধার ভিতর প্রতিপক্ষের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে স্বদেশ স্বার্থকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এই পরিশ্রমের বিপুল আর্থিক মূল্য তো আছেই, তবে তার ব্যয় নির্বাহে দেশ ও জাতির কোন অবদান নেই। এই সব তথ্য উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে জাতি ও দেশ পার্বত্য সংকট থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে। জাতি ও দেশে এই তথ্য উপাত্ত যথার্থভাবে মূল্যায়িত হলে প্রতিপক্ষ নীতিগতভাবে দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। তাই চলমান পার্বত্য সংকটের সমাধানের পক্ষে তথ্য উপাত্তের চর্চা যথার্থ মূল্যায়ন ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮